মহুয়া কথা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়



গুপ্ত প্রকাশিকা
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

—সাড়ে তিন টাকা—

প্রচ্ছদপট :

অঙ্কন : কানাই পাল

ব্লক ও মুদ্রণ : রিপ্রোডাকসন সিণ্ডিকেট

গুপ্ত প্রকাশিকা, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে বাসন্তী দাশগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও নিউ সরস্বতী প্রেস, ভীম ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ পান কর্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীসুকমল ঘোষ

পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু—

এই লেখকের

চলাচল

পঙ্কতপা

সমুদ্র সফেন

নবনায়িকা

জীবন-তৃষ্ণা

কালচক্র

উল্কা

আর্ত মানব

কুমারসম্ভব

এক দিন গেল। দু'দিন গেল। তিন দিন গেল। চার দিন গেল।

পাঁচ দিনের দিন খবরটা যেন খড়ের গাদায় আগুনের ফুলকির মত ছড়িয়ে পড়ল। সকালে ঊর্মিলা খাটের ওপর পা ছড়িয়ে বসে ছিল। বৃদ্ধা শাশুড়ী ঘরে ঢুকলেন প্রথম। মাথায় কাপড় টেনে ঊর্মিলা উঠতে যাচ্ছিল। তিনি ব্যস্ত হয়ে বাধা দিলেন, থাক্ থাক্ উঠতে হবে না, বোসো।

বউয়ের গা ঘেঁষে নিজেও বসলেন তিনি। মুখের কাছে মুখ এনে নিরীক্ষণ করে দেখলেন। ছানি-কাটা চোখে আবছা দেখেন। সময় লাগল তাই। পরে ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যি নাকি? অ্যাঁ? সত্যি?

আশায় আগ্রহে বৃদ্ধার ঘোলাটে চোখও চক্‌চকে দেখাচ্ছে। বউয়ের পিঠে ঘন ঘন হাত বোলাতে লাগলেন তিনি। অধীর কণ্ঠে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, বল না গো, বড় বৌমা যা বললে সত্যি?

ঊর্মিলা সামান্য মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিল, সত্যি।

পিঠের ওপর শাশুড়ীর শীর্ণ হাত থেমে গেল। দু'চার মুহূর্ত চোখ বুজে ইষ্টদেবতাকেই স্মরণ করে নিলেন বোধ হয়। পরে আবার তেমনি ব্যগ্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, তিন মাস ···?

ঊর্মিলা এবারে আরো সুস্পষ্ট ভাবে মাথা নাড়লে।

আসল খবরে নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি চাপা রুক্ষ কণ্ঠে বলে উঠলেন, কি জানি বাছা কেমনতরো কাণ্ডজ্ঞান তোমাদের, আমাকে যমে ভুলেছে বলে তোমরাও ভুলতে বাকি রাখলে না কিছু।···বড় বৌমা কবে জেনেছে, আজ সকালে ?

ঊর্মিলা নত মুখে জবাব দিল, চার পাঁচ দিন।

চার পাঁচ দিন ! আবার কাছে ঘেঁষে এলেন তিনি। প্রচ্ছন্ন উত্তেজনায় মুখখানা বিকৃত দেখালো প্রায়। কানে কানে বলার মত করে বললেন, দেখলে আক্কেলখানা ? আমাকে এই তো একটু আগে জানালো ! আর তোমাকেও বলি, সাত তাড়াতাড়ি বেছে তাকেই আগে বলতে গেলে ? আমাকে খবর দিলে না তো হাঁড়িমুখ করে যেন শোক-কথা শোনালে—ষাট্ ষাট্ ষাট্—তুমি বাছা একটু বুঝেসুজে চ'লো।

আনন্দাতিশয্যে গাত্রোত্থান করে তাড়াতাড়ি তিনি দরজার দিকে অগ্রসর হলেন। এর পরে কি হবে ঊর্মিলা আঁচ করতে পারে। এত কাল ধরে ঠাকুর দেবতাদের যত মানসিক পাওনা হয়েছে, এবারে সেগুলো সব সুদে আসলে মিটবে। কিন্তু আবারও ফিরলেন তিনি। —নিশি খবর পেয়েছে ? তাকে জানিয়েছ তো ?

ঊর্মিলা জবাব দিলে না। এক বারে জবাব না পেলে শাশুড়ী রেগে ওঠেন জেনেও। গলা চড়ল তাঁর, কথাটা তোমার কানে যাচ্ছে না ? নিশিকে খবর দেওয়া হয়েছে ?

ঊর্মিলা এবারে হেসে বলল, জায়গায় জায়গায় ঘুরছেন, কোথায় কোন ঠিকানায় লেখা হবে ? চিঠি আসুক।

সত্যি কথা নয়। আবার এক পসলা থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যেই এ রকম বলল। জবাবটা শাশুড়ীর মনঃপূত হল না খুব। ছেলের উদ্দেশে গজগজ করতে করতে করতে তিনি প্রস্থান করলেন।

দত্ত বাড়িতে পোষ্য-সংখ্যা খুব কম নয়। ছেলেমেয়ে নাতি নাতনী নিয়ে এক জন পিসি-শাশুড়ীর গোটা সংসার এখানে প্রতিপালিত হচ্ছে। শাশুড়ীরই সমবয়সী বিধবা তিনি। খবরটা শাশুড়ী প্রথম তাঁর কাছেই সংগোপনে প্রকাশ করলেন। ফলে অন্যান্য সকলে আধ ঘণ্টার মধ্যেই জেনে গেল। একে একে তারা এসে ঊর্মিলার ঘরে উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল। ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা ভাবতে গেলে খুব সুখবর নয় হয়তো। তবু খবর তো একটা। একেবারে অভাবিত অপ্রত্যাশিত খবর। যে ঝি-চাকরানীদের সাতবার ডেকেও সাড়া পাঁওয়া যায় না, খুঁটিনাটি কাজের অছিলায় তারাও এক আধ বার দর্শন দিয়ে গেল। দুপুরের দিকে পাড়া-প্রতিবেশিনীদের আসা-যাওয়া সুরু হ'ল। খবরটা তাদেরও কানে পৌঁছেচে। খবরের মত খবর, পৌঁছুবে বই কি। কেউ শুধু দেখে গেল। কেউ উপদেশ দিলে। কেউ বা ঠাট্টা-তামাসা করলে। শাশুড়ী মিষ্টি-মুখ না করিয়ে ছাড়লেন না কাউকে। বিকেলের মধ্যে বোধ করি গোটা মহেশপুরে জানাজানি হয়ে গেল, বংশধর আসছে দত্ত-বাড়িতে।

বংশধর! দত্তবাড়িতে? পশুপতিনাথ দত্তের বাড়িতে বংশধর!

এ বিস্ময়ের পিছনে একটুখানি সেকেলে ধরনের ইতিহাস আছে। মহেশপুরে দত্ত-বাড়ির নাম-ডাক পাঠক অনুমান করে নিতে পারেন। সবাই চেনে। আর এ-বাড়ি সম্বন্ধে এখনো এক ধরনের আগ্রহ আছে সকলের মনে। মহেশপুরের মহেশ দত্ত আজ বিস্মৃত পুরুষ। কিন্তু পশুপতিনাথ দত্ত এখনো গল্পের মতই বহুবিশ্রুত। তাঁর রাগ, তাঁর দাক্ষিণ্য আর তাঁর বিলাস-অপচয়—এই তিন নিয়ে তাঁর পরিচয়। ক্রোধের আগুনে বহু জনের সর্বস্ব পুড়েছে, দাক্ষিণ্যের করুণায় বহু জনের সর্বস্ব লাভ হয়েছে। আর অপচয়ের ফাটল দিয়ে প্রাচুর্য-লক্ষ্মী

দ্রুত নিঃসৃত হয়েছে। কিন্তু এ বাড়িতে নতুন বংশধর আসার সম্ভাবনায় লোকের আগ্রহ এবং বিস্ময়ের পিছনে রোমাঞ্চকর কাহিনী আছে। এই বাড়ি বলেই সম্ভবত লোকে ভোলেনি সে কাহিনী। কোন্ সিদ্ধবাক্ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের না কি অভিশাপ আছে, নির্বংশ হবে দত্ত-বংশ। কেউ এর সঙ্গে ব্রাহ্মণের বিধবা কন্যাকে জড়িয়েছে, কারো বা বিশ্বাস, পরদেশীর বিচারালয়ে ব্রাহ্মণের একটি ছেলের ফাঁসীর অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছিল পশুপতিনাথের জটিল ষড়যন্ত্রে এবং বিশ্বাসঘাতকতায়।

একটা অভিনব যোগাযোগও ঘটে যায়। পশুপতিনাথের হঠাৎ খেয়াল হয়, বড় ছেলে আদিত্যনাথ নিঃসন্তান। বছর দশেক আগে তাঁর বিয়ে দিয়েছিলেন। অন্দর মহলে অবশ্য আড়ালে-আবডালে অনেক কথা হ'ত। কিন্তু কর্তার ভয়ে বাইরে কেউ টুঁ শব্দটি করত না। কারণ, এই দুর্ধর্ষ মানুষটির অদ্ভুত দুর্বলতা ছিল বড় বউ শৈলবালার প্রতি। এই একজনের বেলায় স্নেহ-মমতায় একেবারে অন্ধ ছিলেন যেন। একবার বউকে গঞ্জনা দেবার ফলে ছেলেকে খড়ম-পেটা করে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছিলেন তিনি। বাড়ির বউকে এতটা প্রশ্রয় দিতে দেখে শাশুড়ী রাগে জ্বলতেন। আজও সংসারে বড় বউয়ের গুরু-গম্ভীর আধিপত্য দেখে সখেদে স্বর্গগত স্বামীকে টেনে আনেন তিনি—আস্কারা দিয়ে একেবারে মাথায় তুলে দিয়ে গেছে, ইত্যাদি। আজকের কথা থাক। কনিষ্ঠ নিশানাথ তখন ছোট। পশুপতিনাথ হঠাৎ আদিত্যনাথকে ডেকে আদেশ করলেন, আবার বিয়ে করতে হবে, এবং অচিরেই। শুনে আদিত্যনাথ হতভম্ব। পরে অবশ্য খুশি হলেন। বৌয়ের দেমাক ভাঙবে। বাবার ভয়ে হোক বা যে জন্যেই হোক, বউকে বিলক্ষণ সমীহ করে চলতেন তিনি। আর

খুশি বোধ হয় শাশুড়ীও হলেন। কত জায়গা থেকে কত অর্থব্যয় করে এক একটা তাবিচ-কবচ সংগ্রহ করে আনতেন তিনি, কিন্তু ভক্তিভরে সে সব ধারণ করা দূরে থাক, গরবিনী একবার হাতে তুলে নিয়েও দেখেন নি, এবারে বুঝুক মজা—

কিন্তু মজা আবার ফিরে তাঁরাই দেখলেন। বিয়ের কথাবার্তা তোড়জোড় চলছে। শৈলবালা শ্বশুরকে শুনিয়ে শান্ত মুখে জানিয়ে দিলেন, বিয়ে আর একটা ছেড়ে পাঁচটা হোক, তাঁর আপত্তি নেই। কিন্তু এ রকম সংসারে ছেলেপুলে হবার নয়, এটা তিনি জেনে রেখে দিতে পারেন, এর জন্য বাইরে থেকে কারো শাপ-শাপান্তের দরকার ছিল না।

কথাগুলোর ইঙ্গিত স্পষ্ট। পশুপতিনাথ নির্বাক্। সেই থমথমে গম্ভীর মূর্তি দেখে দুরুদুরু বুকে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন সকলে। এবারে নারী-হত্যাই ঘটে কিনা কে জানে। কিন্তু কিছুই ঘটল না। শুধু বিয়ের কথাবার্তা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। তবে যত দিন জীবিত ছিলেন, পুত্রবধূকে আর কাছে ডাকেন নি কোনদিন। দু' বছর না যেতে শৈলবালা যখন বিধবা হলেন, তখনো না। তাঁর অজস্র অপচয়ের মধ্যেও খানিকটা পৌরুষ ছিল, কিন্তু দুর্বলচিত্ত আদিত্যনাথ ভিতরে ভিতরে বিকল হয়ে আসছিলেন অনেক দিন ধরেই। তবু তাঁর মৃত্যুতে ব্রাহ্মণের অভিসম্পাতের যোগাযোগটাই বড় করে দেখলে মহেশপুরের লোকেরা। অভিসম্পাতের দশ বছর আগে থেকেই তিনি যে নিঃসন্তান ছিলেন, এও বিশেষ মনে থাকল না কারো।

তারপর পশুপতিনাথও গত হয়েছেন। একটানা কতগুলো বছর কেটে গেছে। পড়াশুনা শেষ করে নিশানাথ ধীরে সুস্থে বিষয়-আশয়

বুঝে নিয়েছে। শৈলবালা বুঝিয়ে দিয়েছেন। দেওরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা ঠিক প্রীতির নয়, বরং স্নেহের বলা যেতে পারে। কিন্তু তাও অনেকটাই প্রচ্ছন্ন। উচ্চ শিক্ষার দরুন হোক বা যে জন্যেই হোক, বংশগত অপচয়ের প্রভাবটুকু নিশানাথকে তেমন স্পর্শ করেনি। কিন্তু পিতৃকুলের সেই দুর্দম স্বভাব, বনিয়াদী মেজাজ, অথবা খেয়ালী চাল চলনের কিছুটা মিল লক্ষ্য করলে ওর মধ্যেও দেখা যেতে পারে। শিক্ষার সংযম এ দিকেও অনেকটাই রাশ টেনে রেখেছে বটে, তবু বোঝা যায়।

সময় মতই বিয়ে করেছে। সেও আজ আট-ন' বছর হয়ে গেল। কিন্তু ছেলেপুলে হয়নি। হবার আশাও সবাই ছেড়েছে। শাশুড়ী এবারে অবশ্য ঊর্মিলাকে ইচ্ছে মত তাবিচ-কবচ পরিয়েছেন। শৈলবালা দেখেছেন। বাধা দেননি। বরং মাঝে-মধ্যে বিদ্রূপ করে বলেছেন, পর, পরে ছাখ,—এ বাড়িতে ছেলেপুলে হওয়া তো দৈবেরই ব্যাপার!

এ ধরনের শ্লেষ কানে এলে নিশানাথের রক্ত গরম হয়ে ওঠে। অগ্রজের দ্বিতীয় বিবাহ পরিকল্পনার প্রহসন ভোলেনি। তবু চুপ করেই থাকে। ভয়ে নয়, ভক্তিতেও নয়। সে সব ধাতে লেখেনি। বলে না, বলে কিছু লাভ নেই বলে। শৈলবালা ঝগড়া-বিবাদের ধার দিয়েও যাবেন না। তাঁর শান্ত নীরবতাই ফিরে ব্যঙ্গ করবে ওকে। তা ছাড়া, ভ্রাতৃজায়ার অন্তরের বলিষ্ঠতার সঙ্গে ওর নিজের বলিষ্ঠতার কোথায় যেন আপস আছে। সেটা ক্ষুণ্ণ করতে গেলে নিজেরটাও ক্ষুণ্ণ হবেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কপালে করাঘাত করে শাশুড়ী নিজেই হাল ছেড়েছেন, দৈব অনুগ্রহও তাঁর অদৃষ্টে জুটল না ধরে নিয়েই ক্ষান্ত হয়েছেন তিনি।

এহেন দত্ত-বাড়িতে সহসা বংশধর আসার সম্ভাবনায় ঘরে-বাইরে একটা সাড়া পড়ে যাওয়া বিচিত্র নয়।

উর্মিলা নিজেই বোধ করি হতভম্ব হয়েছিল .সব থেকে বেশি। নিশানাথ জাপান গেছে। উদ্দেশ্য, বৈজ্ঞানিক চাষের কি একটা শিখে আসবে। বছর খানেক লাগবে ফিরতে। সে রওনা হওয়ার দিন পনেরর মধ্যে উর্মিলা খেয়াল করল, মাসটা একটা ব্যতিক্রমের মধ্য দিয়ে কেটে গেল। ব্যতিক্রমটা পরের মাসেও বজায় থাকল। উর্মিলা বিশ্বাস করবে এমন সাহস নেই। অথচ কিছু একটা ঘটছে সন্দেহ নেই। মুখে একেবারে তালা এঁটে দুরু-দুরু বক্ষে প্রতীক্ষা করতে লাগল সে। তৃতীয় মাসে আর কোনো সন্দেহ রইল না, কতকগুলো লক্ষণ সুস্পষ্ট উপলব্ধি করল সে। আর গোপন রাখা সমীচীন নয়। কিন্তু একমাত্র বড়জা' ছাড়া বলবেই বা কাকে ? শৈলবালার কর্তব্য-পরায়ণতার ওপর সবারই আস্থা।

তাঁকেই বলল। শৈলবালা হঠাৎ যেন বুঝে উঠলেন না কি বলতে চায়। বোঝামাত্র স্বভাববিরুদ্ধ আনন্দোচ্ছ্বাসে জড়িয়ে ধরতে চাইলেন তাকে। কিন্তু মাত্র কয়েক মুহূর্ত। তার পরেই হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলেন যেন। নিষ্পলক চোখে চেয়ে রইলেন শুধু। অনেকক্ষণ। স্বভাবগত গাম্ভীর্যের আবরণে নিজেকে সংযত করে নিলেন। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলেন, তিন মাস বললি নে ?

উর্মিলা এ ভাব-পরিবতন দেখে মনে মনে অসন্তুষ্ট হয়েছে। ঘাড় নাড়ল।

ঠাকুরপো জেনে গেছে ?

না, যাবার দিন পনের বাদে তো প্রথম টের পেলাম।

পরে জানিয়েছিস ?

ঊর্মিলা মাথা নাড়ল আবারও, জানায় নি।

কেন ? প্রায় তীক্ষ্ণ শোনাল কণ্ঠস্বর। চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা আগেই ফুটে উঠেছে।

ঊর্মিলা জবাব দিল, ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারি নি। মনে মনে উষ্ণ হয়ে উঠছে সে। কিন্তু কি আর করবে।

শৈলবালার দু'চোখ তার মুখের ওপর। জিজ্ঞাসা করলেন, আমাকেই বা আগে বলিস নি কেন ?

বললাম তো, নিজেরই ঠিক বিশ্বাস হয়নি। হাসল। এই বড় জা'টিকে শক্ত কথা কিছু বলতে হলে হাসি মুখেই বলতে হবে। বলল, হল কি, তুমি যে দেখি একেবারে পুলিসের জেরা সুরু করে দিলে !

শৈলবালা আর বললেন না কিছু। শুধু আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে উঠে চলে গেলেন। ফিরে দেখলে দেখতে পেতেন, ঊর্মিলা আগুন হয়ে চেয়ে আছে তাঁর দিকে। এই অপ্রত্যাশিত সংবাদটা ঈর্ষার কারণ হতে পারে ঊর্মিলা একবারও ভাবে নি। এখন যেন তাই মনে হচ্ছে।

সন্দেহটা পরদিন থেকে ঘনীভূত হল আরও। এক দুই করে পর পর চার দিন কেটে গেল, অথচ বড় জা' মুখ খুললেন না কারো কাছে। শুধু উঠতে বসতে চলতে ফিরতে নিঃশব্দে লক্ষ্য করে গেলেন তাকে। ঊর্মিলা সেটা বুঝেও না বোঝার ভাণ করে কাটিয়েছে। মনে মনে শঙ্কিতও হয়েছে সে। নিশানাথ নেই এখানে, এখন ওনার ওপরেই সব নির্ভর। অথচ মতি-গতি যা দেখছে···

পাঁচ দিনের দিন আবার ঠিক বিপরীত কারণে রাগ হল বড় জা'য়ের ওপর। চার চারটে দিন মুখ শেলাই করে কাটালেন, আবার যখন ঢাক-পেটানো সুরু করেছেন, তখন আর বাকি নেই কেউ। ওর ধারণা,

তাঁর জন্যেই খবরটা এ ভাবে ছড়িয়েছে। সারা দিন নানা শুভার্থিনীর পদার্পণে মুখ বুজে বসে থেকেও যেন একটা ধকলের মধ্য দিয়ে কাটল। সন্ধ্যে পার হতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সে সটান বিছানায় শুয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ বাদে বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল আবার। এবারে পুরুষের ভারী পায়ের শব্দ। ঊর্মিলা উৎকর্ণ হল্। শব্দটা চেনা বটে। বিরক্তি নয়, বরং খুশির ছোঁয়া লাগল মুখে। উঠে বসল।

বাইরে থেকে গলা শোনা গেল, আসব ?

আসুন। ঊর্মিলা শাড়ির আঁচল মাথায় টেনে দিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

শৈলবালার ছোট ভাই শশাঙ্ক। শশাঙ্ক বোস। হাসি চেপে ভুরু কুঁচকে ঊর্মিলার দিকে চেয়ে রইল সে।

বসুন।

শশাঙ্ক শয্যার অপর প্রান্তে আসন নিয়ে তেমনি ছদ্ম গাম্ভীর্যে বলল, এই কাণ্ড তোমার ?

ঊর্মিলা বিস্ময়ের ভাণ করল, কি কাণ্ড ?

শশাঙ্ক হাসল এবার।—ও, নিজের কানে শুনলে অমৃত ঝরবে বুঝি। বলব ?

থাক বলতে হবে না। ঊর্মিলা বিরক্তির ভাব দেখিয়েও হেসে ফেলল, আপনি শুনলেন কোথায় ?

শশাঙ্ক হাসতে হাসতে জবাব দিল, শুধু আমি ? আজকে না ভুভ ছ্যাখো তুমি, ভাবী বংশধরের পিতামহ পশুপতিনাথও স্বর্গ থেকে হোক বা নরক থেকে হোক, ছুটে আসতে পারেন। শুভ সংবাদ হয় তো সেখানে পর্যন্ত পৌঁছে গেছে এতক্ষণে।

হঠাৎ কি মনে পড়তে হাসি থামল তার। জিজ্ঞাসা করল, রাস্কেলটা খবর জেনেছে তো ?

কার উদ্দেশে এই মধুর সম্ভাষণ জেনেও ঊর্মিলা নিরীহ মুখে ফিরে জিজ্ঞাসা করলে, কোন্ রাস্কেলটা ?

তোমার রাস্কেল, আবার কোন্ রাস্কেল।

আমার কোনো রাস্কেল-টাস্কেল নেই। স্বামি-নিন্দা শুনলে রেগে যাবো বলছি।

শশাঙ্ক হেসে আবার জিজ্ঞাসা করল, জেনেছে ?

আপনার এক যুগ দেখা নেই, খবর দেবে কে ?

জবাবে শশাঙ্ক একটা স্থূল ঠাট্টা করতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই শৈলবালা ঘরে প্রবেশ করলেন। একে একে ছু'জনের দিকেই তাকালেন। পরে ভাইকেই জিজ্ঞাসা করলেন, কখন এসেছিস ?

এই তো। শুধু হাতে যে, মিষ্টি কই ?

মুখে কোনো ভাবলেশ নেই শৈলবালার। ঠাণ্ডা গলায় বললেন, তোকে একটা খবর পাঠাব ভাবছিলাম, কথা আছে শুনে যাস।

যেমন এসেছিলেন তেমনি চলে গেলেন। শশাঙ্ক ঈষৎ বিস্মিত নেত্রে তাকালো ঊর্মিলার দিকে।—কি ব্যাপার ?

ঊর্মিলা ঠোঁট উল্টে দিলে, কি জানি—।

এই লোকটির সঙ্গে ঊর্মিলার হৃদ্যতা সহজ অনুমান-সাপেক্ষ। হৃদ্যতা নিশানাথের সঙ্গেও আছে। কিন্তু সে এক অদ্ভুত পরস্পর-বিরোধী হৃদ্যতা। ছোট থেকে একসঙ্গে পড়েছে, একসঙ্গে খেলাধুলা করেছে, একসঙ্গে বড় হয়েছে। কিন্তু ওদের ছেলেবেলার রেষারেষি আজও তেমনি আছে। কে কাকে ব্যঙ্গ করবে বিদ্রূপ করবে জব্দ করবে এই নিয়েই আছে। সোজাসুজি বাক্যালাপ পর্যন্ত বন্ধ বহু কাল

ধরে। কারণটাও কম বিচিত্র নয়। একদা পাখি শিকারে বেরিয়েছিল নিশানাথ। সঙ্গে শশাঙ্কও আছে। কেউ কাউকে শ্লেষ না করে এক মুহূর্ত থাকতে পারে না, তবু পরস্পরের সঙ্গটা চাই।. শিকার জিনিসটা শশাঙ্কর পছন্দ নয় তেমন। বন্দুক বাগিয়ে ধরে পাখির ঝাঁকের দিকে সন্তর্পণে এগোচ্ছিল নিশানাথ, শশাঙ্ক পিছনে দাঁড়িয়ে। আর একটু এগিয়ে গেলেই হয়, হঠাৎ পিছন থেকে এক ঢিলে শশাঙ্ক পাখির ঝাঁক দিলে উড়িয়ে। নিশানাথ নিশানা ঘুরিয়ে দিলে, শশাঙ্ক পিছনে দাঁড়িয়ে হাসছে—সেই দিকে। শশাঙ্ক ভাবলে ভয় দেখাচ্ছে। নিশানাথ ঘোড়া টিপলে। হাতের বন্দুক গর্জে উঠল। গুলী শশাঙ্কর কাঁধ থেকে কোমরে ঝোলানো বিশালকায় থলেটা বিদীর্ণ করে বেরিয়ে গেল। আস্তে আস্তে মাটিতে বসে পড়ল শশাঙ্ক। ঠোঁট দুটো কাঁপছে থর-থর করে। মৃত্যু-বিবর্ণ।

নিশানাথ বন্দুক কাঁধে ফেলে তার কাছে এসে দাঁড়াল। চোখে যেন তখনো পাখি-মারা একাগ্র দৃষ্টিটা বসে আছে। বলল, এইন্‌টা কেমন দেখে রাখো।

শশাঙ্ক আর একটি কথাও না বলে বাড়ি ফিরেছে। সেদিন মর্মান্তিক দুর্ঘটনা কিছু ঘটে যাওয়া বিচিত্র ছিল না। এর পরে নিশানাথ তার বাড়ি আসতে শশাঙ্ক স্পষ্ট জানিয়ে দিল, তার সঙ্গে বাক্যালাপ রাখতেও সে ঘৃণা বোধ করে। দেহের রক্তকণিকা আবার টগবগিয়ে উঠল নিশানাথের। কিন্তু কিছু না বলে সে ফিরে এলো।

সেই থেকে মুখোমুখি কথাবার্তা বন্ধ। সময়ে ক্রোধ উপশম হয়েছে দু'জনারই। তবু। শশাঙ্কর বুদ্ধির ধার বেশি, আর নিশানাথের আভিজাত্যের পৌরুষ বেশি। ঠোকাঠুকি লেগেই আছে। শৈলবালা মাঝে থাকার দরুন যোগাযোগটা বন্ধ হয়নি। নিশানাথের বিয়ের পর

দেখা-শুনাও আরো বেড়েছে। তার বিয়েতে প্রধান উদ্যোগী কর্মকর্তা ছিল শশাঙ্ক। এর আগে অবশ্য শশাঙ্কর পিতৃশ্রাদ্ধ নিশানাথ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে নির্বাহ করে দিয়ে এসেছিল। এখন ঊর্মিলা বা শৈলবালা অথবা তৃতীয় ব্যক্তি আর কেউ কাছে থাকলে পরোক্ষে পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা চলে। সে কথাবার্তাও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ছাড়া আর কিছু নয়। আর এখনো সেই রেষারেষি অনেক সময়েই মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। নিশানাথ সহজে তেতে ওঠে। কিন্তু শশাঙ্কর মেজাজ অনেক ঠাণ্ডা, তাই তার সুবিধেও বেশি।

বছর খানেক আগের কথা। শশাঙ্ক কি একটা শক্ত অসুখে পড়তে কলকাতা থেকে বড় ডাক্তার এনে সাড়ম্বরে তার চিকিৎসা সুরু করে দিল নিশানাথ। শশাঙ্ক সেরে উঠল। এর মাস পাঁচ ছয় বাদে কি করে যেন পা মচকে যায় নিশানাথের। বিছানায় শুয়ে আছে, ঊর্মিলা কি একটা মালিস করে দিচ্ছে। হঠাৎ সবিস্ময়ে দেখে, শশাঙ্ক গম্ভীর মুখে এক জন বড় সার্জেন নিয়ে এসে হাজির। ইশারায় রোগী দেখিয়ে দিতে সার্জেন পায়ের দিকে মনোনিবেশ করলেন। নিশানাথের ইচ্ছে হল, সার্জেনকে ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দিয়ে শশাঙ্ককে জব্দ করে। কিন্তু মুখ বুজেই রইল সে। সার্জেন পা দেখে মনে মনে হেসে গম্ভীর মুখে একটা লম্বা প্রেসক্রপশান লিখে দিয়ে ফীস্ নিয়ে প্রস্থান করলেন। ঊর্মিলার বিস্ময় কাটেনি তখনো। নিশানাথ আড়চোখে একবার শশাঙ্কর মুখের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে স-মনোযোগে প্রেসক্রপশানটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ল।

শশাঙ্ক ঊর্মিলাকে লক্ষ্য করে বলল, একটু চুণ-হলুদ গরম করে লাগিয়ে দাও। মুচকি হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

ঊর্মিলা প্রথম প্রথম এদের রকম-সকম দেখে ভারী অবাক হত।

পরে বেশ মজাই লাগত তার। বলত, বুড়ো খোকারা ঝগড়া করে সবাই দেখে হেসে মরে! এখন অবশ্য ব্যাপারটা গা-সওয়া হয়ে গেছে। তবু মাঝে মাঝে অবাক লাগে তার, দু-দুটো লোক এ ভাবে বছরের পর বছর কাটায় কি করে! ঊর্মিলার এখনও সন্দেহ হয় মাঝে মাঝে, শশাঙ্ক সাড়ম্বরে চালের কারবারে নেমেছে বলেই তার ওপর টেক্কা দেবার জন্যে নিশানাথ জাপান গেছে বৈজ্ঞানিক কৃষিবিদ্যা শিখতে।

তিন চার দিনের মধ্যেই চিকিৎসক এনে ঊর্মিলাকে দেখানো হল। এত তাড়াতাড়ি এর দরকার ছিল না সেটা ঊর্মিলাও জানে। ভাইকে দিয়ে বড় জা' এই ব্যবস্থা করেছেন জানা কথা। সমস্ত দিনে তার সঙ্গে এখন দু' চারটে কথাও হয় কি না সন্দেহ, এ দরদে মন ভিজল না। শাশুড়ী অবশ্য সত্যিই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। চিকিৎসক একবার পরীক্ষা করে কিছু মামুলী বিধিনির্দেশ দিয়ে বলে গেলেন, দু'মাসের আগে আর তাঁর দেখার প্রয়োজন নেই। তবে, তেমন দরকার হলে যেন তাঁকে খবর দেওয়া হয়।

রাত্রিতে ঊর্মিলা চিঠি লিখতে বসল নিশানাথের কাছে। এটা দ্বিতীয় চিঠি। অনেক কাটা-ছেঁড়া অদল-বদল করে প্রথম চিঠিতে বারতা পাঠিয়েছে। লজ্জা কেটে যাওয়ায় এবারে অনেকটা সহজ ভাবেই লিখতে বসল। কিন্তু লেখা হয়ে উঠছে না। বছর খানেক বাদে নিশানাথ ফিরে এসে পরিবর্তনটা কি রকম দেখবে, কল্পনায় সেই দৃশ্যটা আস্বাদন করতে করতেই অনেকক্ষণ কেটে গেল।

...নিশানাথ সন্তান চেয়েছে। মনে-প্রাণে চেয়েছে। বংশের গায়ে ও-রকম একটা কালি লেগে আছে বলেই আরো বেশি চেয়েছে।

কোনো দিন সে এটা ব্যক্ত না করলেও ঊর্মিলা বুঝতে পারতো। নিশানাথ মুখে বরং উল্টো কথা বলতো। বলতো, দরকার নেই তার ছেলেপুলের। ওকে নিয়েই দিব্যি সুখে আছে।

সুখে আছে একথা অবশ্য ঊর্মিলাই ভাবত মনে মনে। কিন্তু মুখ ফুটে সে নিশানাথকে একবার অনুরোধ করেছিল, কলকাতায় একবার তাকে কোনো ভালো ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে। শুনে নিশানাথ যেন চমকে উঠেছিল প্রথমটা। পরে হাল্কা ভাবেই জিজ্ঞাসা করেছে, কেন আমাকে নিয়ে তোমার চল্‌ছে না?

খুব চল্‌ছে, কিন্তু হবে না-ই বা কেন? বাড়িতে কাউকে কিছু না জানিয়ে চলো না একবার যাই?

নিশানাথ গম্ভীর মুখে জবাব দিয়েছে, আমরা ছু'জন ছু'জনকে নিয়ে বেশ সুখে আছি জানতুম।

এই তুচ্ছ কথার মান ভাঙ্গাতে ঊর্মিলার যেন একটু বেশি সময় লেগেছিল। নিরালা রাতে স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হয়ে স্বীকার করেছে, শাশুড়ীর কথা ভেবে, বংশের কথা ভেবে, তার মাঝে মাঝে ভারী ইচ্ছে করে বটে একটি সন্তান আসুক—নইলে সত্যিই এ নিয়ে নিজের তার বিশেষ খেদ নেই।

আজ কিন্তু মনে হচ্ছে ঊর্মিলার, খুব সত্যি কথা বলেনি সেদিন। মনে হচ্ছে, যে আসছে সে না এলে জীবনই বৃথা। ভাবতে ভাবতে সে রাত্রে চিঠি লেখা হল না।

একদিন ছু'দিন করে আরো ছু'মাস কেটে গেল। দেহের অস্বস্তি যেন ক্রমশই বাড়ছে ঊর্মিলার। কিন্তু তার থেকে চতুর্গুণ বেশি অস্বস্তি মনের।

ইতিমধ্যে কোথায় যেন একটা ছুর্যোগ ঘটে গেছে।

বিগত দু'মাসের মধ্যে এয়ারমেলে পর পর সাতখানা চিঠি লিখেছে ঊর্মিলা, কিন্তু নিশানাথ একখানারও জবাব দেয়নি। শেষে তার পাঠানো হয়েছে। তারের জবাব অবশ্য এসেছে। সেও তার কাছে নয়, শৈলবালার কাছে। সংক্ষিপ্ত জবাব। সে ভালো আছে, তার জন্যে কোনো চিন্তার কারণ নেই।

আরো এক মাস গেল। ঊর্মিলা আবারো চিঠি লিখল। চিঠিতে মাথা খুঁড়ল প্রায়। কি হয়েছে, কেমন আছ, জানাও। শেষে আবার তার পাঠালো। এবারও ভ্রাতৃজায়াই জবাব পেলেন।—ভালো আছে, চিঠি লিখে বা তার পাঠিয়ে তাকে যেন আর বিরক্ত না করা হয়। মান অভিমান ভুলে ঊর্মিলা শৈলবালার কোলে মুখ গুঁজে ভেঙ্গে পড়ল এবার। শৈলবালা তেমনি কঠিন নীরব। একটি কথাও বললেন না। ঊর্মিলা মুখ তুলে দেখে, তার মুখ কাগজের মত শাদা।

শশাঙ্ক ডাক্তার নিয়ে এলো আবার। তিন মাস আগে সেরকম কথাই ছিল। কিন্তু ঊর্মিলা বিছানায় মুখ গুঁজে পড়ে আছে সেই থেকে। দিদির শরণাপন্ন হল শশাঙ্ক। কি ব্যাপার, ডাক্তার বসে আছে, ওদিকে যে উঠ্ছেই না!

রূঢ় কঠিন কণ্ঠে শৈলবালা ঝাঁঝিয়ে উঠ্লেন প্রায়, উঠ্ছে না তো আমি কি করব! আর তোরই বা অত দরদ কিসের? না ওঠে তো ডাক্তারকে বিদেয় করে দিয়ে নিজের কাজ ছাখগে যা।

শশাঙ্ক হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। নিশানাথের ব্যবহার তারও অজ্ঞাত নয়। দিন কতক আগে সেকথা শোনার পর আক্রোশে একেবারে ফেটে পড়েছিল। চড়া গলায় কটূক্তি করে উঠেছিল, তোমাদের অত সাধের বনেদি ঘরের ছেলেদের বিশেষত্বই তো এই—কোথায় কার খপ্পরে গিয়ে পড়েছে ছাখো। শৈলবালা সেদিনও

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ধমকে উঠেছিলেন তাকে। তাঁর চোখের সেই জ্বলন্ত দৃষ্টির আঁচ যেন গায়ে এসে লাগছিল। ঊর্মিলাও ছিল সেখানে। শশাঙ্কর মন্তব্য শুনেই সম্ভবত একবারও মুখ তোলেনি।

শশাঙ্ক সোজা ঊর্মিলার ঘরে এসে ঢুকল। বাহুতে মুখ ঢেকে শুয়ে আছে সে। ঈষৎ রুক্ষ কণ্ঠে বলল, ডাক্তার এসে বসে আছেন অনেকক্ষণ, তাঁকে এখানে নিয়ে আসব না ফিরে যেতে বলব?

সাড়া-শব্দ নেই।

চলে যেতে বলি তাহলে? আমারও এত সময় নেই যে একটা অপদার্থ লোকের কথা ভেবে ভেবে তুমি নিজের সব কিছু মাটি করবে আর আমি বসে বসে সাধ্য-সাধনা করব। উঠবে?

ঊর্মিলা চোখের ওপর থেকে হাত নামালো। বসলও উঠে। ফর্সা মুখ নিঃসাড় পাণ্ডুর দেখাচ্ছে। শশাঙ্ক চেয়ে রইল খানিক। পরে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। একটু বাদেই চিকিৎসক সঙ্গে করে ফিরল আবার। শৈলবালাও এলেন। শশাঙ্ক বাইরে এসে বারান্দার রেলিংএ ঠেস দিয়ে দাঁড়াল।

এখনও চিকিৎসকের দেখবার বিশেষ কিছু নেই। নিয়মিত পরীক্ষা শুরু হবে মাস খানেক পর থেকে। তবে, ঊর্মিলার শরীরের জন্য একটু উদ্‌বেগ প্রকাশ করে গেলেন।...শরীর এ সময়ে খারাপ হয় বটে, তবে এ যেন একটু বেশি খারাপ।

বাড়িতে কি একটা অশান্তি চলেছে শাশুড়ী ঠিক বুঝে ওঠেন না। নিশানাথের খবর জিজ্ঞাসা করলে শৈলবালা বলেন, ভালো আছে। শাশুড়ী ধরে নিয়েছেন হিংসেয় মুখখানা অমন পাথর করে রেখেছে বড় বৌ। চুপি চুপি ঊর্মিলাকে জিজ্ঞাসা করেন, কেউ কোন দুর্ব্যবহার করে কি না তার সঙ্গে। ঊর্মিলা মাথা নাড়ে। চোখে তিনি কম

দেখেন। উর্মিলার সারা গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলেন, ভারী রোগা হয়ে গেছ যে! নিজের হাতে পাঁচ রকম মুখরোচক খাবারের ব্যবস্থা করেন। এ ছাড়া আর এক চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত তিনি। সাত মাস এসে পড়ল। ঘটা করে সপ্তামৃত দিতে হবে বঁউকে। কোনো বাড়ির এয়ো বাদ থাকবে না। সবাইকেই ডাকতে হবে। দত্ত বাড়িতে আসছে বংশধর, এতে আর যাই হোক, কোন কার্পণ্য বরদাস্ত করতে পারবেন না তিনি।

উর্মিলার থেকে থেকে মনে হয়, সমস্ত শরীরটা কেমন যেন বিষিয়ে উঠছে। মন বিষিয়ে যাচ্ছে ব'লে কি? কিছু ভাল লাগে না তার। কিছু না। এ সময়ে নাকি একটু নড়াচড়ার ওপরে থাকতে হয়। কিন্তু নড়তে-চড়তে বিষম কষ্ট। দিনের বেশির ভাগ সময়ই শুয়ে কাটায় আর আবোল তাবোল ভাবে।

সেদিনও সকালের দিকে শুয়েই আছে।....বাইরে যেন অনেকের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। একটু কোলাহলও। পরক্ষণে ঝি উর্ধ্বশ্বাসে ঘরে ঢুকে খবর দিয়ে গেল, ছোটবাবু এসেছেন গো বৌদিমণি! কর্তামায়ের সঙ্গে কথা কইছেন।

উর্মিলার বুকের ভেতরটা আচমকা ধড়াস করে উঠল। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল সে। নিচের দিকে কেমন একটা যাতনা অনুভব করল। তাড়াতাড়ি উঠতে গেছে বলেই বোধ হয়। দরজার দিকে তাকালো। উত্তেজনায় বুক কাঁপছে ঠক ঠক করে।

ভারী জুতোর শব্দ শোনা গেল বাইরে। ধীর পদক্ষেপে কেউ আসছে। নিশানাথ—। উর্মিলার স্বামী নিশানাথ। শয্যার হাত দুই দূরে এসে দাঁড়াল।

পরস্পরের দৃষ্টি সংবদ্ধ থাকে কিছুক্ষণ। সামলে নিয়ে উর্মিলাই প্রথম কথা বলল। কিন্তু ঠোঁট দুটো কেঁপে কেঁপে উঠছে থর-থর করে।

....কেমন আছ ?

নিশানাথ চেয়ে আছে তেমনি। পরে বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে শয্যার ওপরেই বসল। চোখ দুটো একবার উর্মিলার সারা দেহে বিচরণ করে বেড়াল, যেন বিশ্লেষণ করে করে দেখছে কিছু। তারপর সেই স্থির সূক্ষ্ম দৃষ্টি ওর মুখের ওপর ফিরে এসে থামল। জবাব দিলো, ভালো—।

এমন না জানিয়ে চলে এলে যে ?

এলাম ....কেন খুশি হওনি ?

এই কথাগুলোই অনুরাগসিক্ত হলে অন্য রকম শোনাত। কিন্তু সে রকম শোনাল না। উর্মিলা নির্বোধ নয়। যে নিশানাথ বিদেশে গিয়েছিল, আর যে নিশানাথ ফিরে এসেছে তারা একই মানুষ হলেও এক যে নয় এটা সে উপলব্ধি করতে পারে। তফাতের পরিমাণটা বুঝতে হবে, তফাতের কারণটা বুঝতে হবে। চোখের জল জোর করে ঠেলে আবার যেন ভেতরে পাঠিয়ে দিলে সে। কাঁদবে কি !...কৈফিয়ৎ নেবে। সে শক্ত হবে। কঠিন হবে। কথা কটা শোনা মাত্র সারা দেহে যেন জ্বালা ধরে গেল। কিন্তু তাড়া কিছু নেই। এত দিন তিলে তিলে জ্বলেছে, আরও দু'চার ঘণ্টা সহ্য হবে। উর্মিলা দেখছে চেয়ে চেয়ে।

দরজার কাছে শৈলবালা এসে দাঁড়াতে নিশানাথ খাট ছেড়ে খানিকটা এগিয়ে এলো। উর্মিলা মাথায় কাপড় দিলে। শৈলবালা ঘরে প্রবেশ করলেন। নিশানাথ পায়ের ধূলো নিলে। তিনি

মুখের দিকে চেয়ে রইলেন স্বল্পক্ষণ। পরে বললেন, যে চালের চাষ শিখতে গিয়ে এমন মূর্তি করে আনলে, সে চাল লোকের সহ্য হবে তো?

নিশানাথের মুখে হাসির মত দেখা দিল একটু। জবাব দিল. কি মনে হয়, সহ্য হবে না?

কোনো অর্থ আছে কি না কে জানে। শৈলবালার সহজ ভাবটা মিলিয়ে গেল। ঊর্মিলার দিকে তাকালেন একবার। সে নতনেত্রে বসে আছে। পরে শান্ত কণ্ঠেই জিজ্ঞাসা করলেন, কত দিনের মধ্যে একটা খবর পর্যন্ত নেই....হুট্ করে চলে এলে যে?

নিশানাথ নিস্পৃহ জবাব দিল, পাসপোর্ট পেলে আরো আগেই আসতুম। হাসল।—আমার খবরের জন্যে তোমরা সবাই খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলে, না?

না, আমরা আর এমন কি আপনার লোক, তবে মা আছেন বাড়িতে, সেটা খেয়াল রাখতে পারতে।

শাশুড়ীর বোধ হয় এখনও আয়ুব জোর আছে। দ্বারপ্রান্তে দেখা দিলেন। তাড়াতাড়ি জপটা সেরে এলেন বোধ হয়। বললেন, তুই এখনো রাস্তাব জামাকাপড় পর্যন্ত ছাড়িস নি! ও-গুলো ছেড়ে হাত-মুখ ধো। নয়তো একেবারে চানই করে আয় আগে। জল-টল খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে তার পর যত খুশি গল্প কর বসে।

শৈলবালার দিকে চেয়ে একগাল হাসলেন তিনি। দেখো বড় বৌমা, ভগবান কেমন সুমতি দিয়েছেন ওকে। যত দিন যাচ্ছে, আমি তো ভয়ে সেধোচ্ছিলাম, কে দেখে কে শোনে। খেয়াল হ'ল বোধ হয়, এ রকম বলাটা ঠিক হল না। তাড়াতাড়ি শুধরে নিতে গেলেন, শশাঙ্ক আছে তাই নিশ্চিন্দি। ডাক্তার ডাকা ওষুধ আনা

খোঁজা খবর করা—সোনার টুকরো ছেলে, নইলে পরের ছেলে কে আর অতটা করে ?

নিশানাথ বক্র কটাক্ষে ঊর্মিলার দিকে তাকালো একবার। পরে শৈলবালার দিকে। নিষ্প্রাণ পটের মূর্তি। ঝিয়ের মুখে কুল-পুরোহিতের আগমন-বার্তা শুনে বৃদ্ধা ব্যস্ত হয়ে চলে গেলেন। পরশু কাজ, তাঁর নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই।

নিশানাথ জিজ্ঞাসা করল, কি একটা উৎসবের কথা যেন বলছিলেন মা, কবে ?

শৈলবালা জবাব দিলেন, পরশু। পরে বললেন, চান-টান যা করবে করো, আমি এদিকে দেখছি। তিনি নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

নিশানাথ শয্যায় বসল আবার। জামার বোতাম খুলতে খুলতে নিরাসক্ত কণ্ঠে বলল, দত্ত-বাড়িতে বংশধর আসছে তা হলে....?

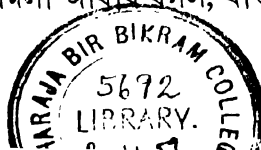
ঊর্মিলা নিরুত্তরে অন্য দিকে চেয়ে বসে রইল। নিশানাথ কি ভেবে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, শশাঙ্ক ব্যবসা-ট্যাবসা ছেড়ে দিয়েছে ?

ঊর্মিলা তাকালো তার দিকে।—ছাড়বে কেন ?

ডাক্তার ডেকে ওষুধ-পত্র এনে এত খোঁজ-খবর করে আর ব্যবসার সময় পায় ?

ওদের একজনের বিরুদ্ধে আর এক জনের এ রকম ঠেস দেওয়া কথা শুনে শুনে অভ্যস্ত ঊর্মিলা। আজ সশ্লেষে পাল্টা প্রশ্ন করল। —তুমি এত দিন নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছিলে কেন ? দরকার হলে সব ছেড়ে-ছুড়ে সে এখানে এসে বসে থাকতে পারে সেই ভরসায় ?

নিশানাথ দেখছে। ঊর্মিলা আবার বলল, যাও চান সেরে এসো, দিদি অপেক্ষা করছেন।



নিশানাথ হঠাৎ হাসতে হাসতেই উঠে ঘর ছেড়ে চলে গেল। ঊর্মিলার মনে হল, মানুষটার হাসিও বদলেছে, তাতেও শ্রী নেই।

বিকেলের আগে নিশানাথের আর দেখা পাওয়া গেল না। ঊর্মিলা খোঁজ নিয়ে জেনেছে, বাইরের মহলে আছে। বিকেলে মায়ের সঙ্গে স্বল্পক্ষণ কথাবার্তা বলে নিশানাথ ভ্রাতৃজায়ার ঘরের পাশ কাটাতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। ঘরে আর কেউ আছে। গলার স্বরে বুঝল কে। ভাবলো ভিতরে ঢোকে। কিন্তু কি ভেবে চলে এলো।

ঊর্মিলা খাটের রেলিংএ ঠেস দিয়ে চুপচাপ বসে আছে। ক্লান্ত লাগছে। আর কেমন একটা যাতনাও। কিন্তু ভিতরের বিক্ষোভ আরও বেশি। নিশানাথ এলো। অদূরে একটা চেয়ার টেনে বসে হাই তুলল।

ঊর্মিলা শান্তমুখে জিজ্ঞাসা করল, সারা দুপুর ঘুমুলে ?

হ্যাঁ।

এখানে ঘুম হ'ত না ?

নিশানাথ জবাব দিল, না।

একটু বাদে ঊর্মিলা আবার প্রশ্ন করল, যা শিখতে গেছলে শেখা হয়ে গেছে ?

না। শেখার কি আর শেষ আছে···? চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে।

কোথায় যাচ্ছ ?

ঘুরে আসি।

দাঁড়াও। ঊর্মিলার মুখে বিকৃত রেখা পড়ে গেল।—বোসো, আমার কিছু শোনবার আছে।

নিশানাথ তার মুখের দিয়ে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল

কিছুক্ষণ। পরে হাল্কা জবাব দিল, তাড়া কিসের—আপাততঃ আমি আছি এখানে।

নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। ইচ্ছে করেই শৈলবালার ঘরের পাশ দিয়ে চলল সে। কিন্তু এবার আর কারও কণ্ঠস্বর কানে এলো না। কি ভেবে ঘরে ঢুকল। শৈলবালা মেঝেতে একাই বসে ছিলেন। উঠে একটা আসন পেতে দিতে গেলেন।

নিশানাথ বলল, না বসব না এখন, এদিক দিয়ে আসতে তখন শশাঙ্কর গলা শুনলাম যেন, চলে গেছে ?

শৈলবালার কণ্ঠস্বর মৃদু শোনাল্।—এই তো গেল।

নিশানাথ হাসতে লাগল। বলল, বাড়ি এসেও জাপান-ফেরত মূর্তিটি দেখে গেল না!

কোন রকম শ্লেষ সহ্য করাটা ধাতে নেই শৈলবালার। বললেন, আমি দেখা করে যেতে বলেছিলাম তাকে। বলল, গরজ থাকে তো তুমি তার বাড়ি গিয়ে দেখা কোরো, তার অত সময় নেই।

হুঁ ? হাল্কা বিস্ময়।—কিন্তু যাবার সময় তো কলকাতা পর্যন্ত এগিয়ে দেবারও সময় ছিল!

শৈলবালা এবারে চুপ। শশাঙ্ক নিশানাথকে কলকাতা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গিয়েছিল ঊর্মিলার চলনদার হিসেবে। তাকে রওনা করিয়ে দিয়ে সে ঊর্মিলাকে নিয়ে মহেশপুরে ফিরেছে।

সেদিন রাত্রিটাও সদরে কাটালো নিশানাথ। পরদিন সকালে ঊর্মিলা শুনল, খুব ভোরে কলকাতা ছেড়ে চলে গেছে সে। তাকে জানায়নি কিছু। মা এবং বৌদিকে নাকি বলে গেছে। কিন্তু তাঁরাই এসে ওকে নানা ভাবে জেরা করতে লাগলেন। হঠাৎ কলকাতায় তার এমন কি জরুরী কাজ পড়ল। আজ বাদে কাল একটা শুভ

কাজ, অথচ ছেলে এত দিন বাদে বাড়ি এসে জেনে-শুনেও চলে গেল! ছেলেকে অবশ্য জিজ্ঞাসা করেছেন এবং আটকাতে চেয়েছেন। কিন্তু তার দিকে চেয়ে বেশি কিছু বলতে সাহস পাননি। ঊর্মিলার কাছে এসে ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হঁয়েছে বলো তো বৌমা, আমার যেন কিছু ভাল লাগছে না।

ঊর্মিলা জবাব কি দেবে। তার বেদনা-বিবর্ণ মুখ বিকৃত হয়ে উঠল শুধু।

সেদিন গেল। পরদিন তাকে নিয়ে যেন কাড়াকাড়ি পড়ে গেল নিমন্ত্রিতা এয়োদের মধ্যে। উঠতে বসতে কষ্ট হচ্ছে। ভেতরের যাতনাটা বেড়ে চলেছে। তবু কলের মত তাকে উঠতে হচ্ছে বসতে হচ্ছে। কথা বলতে হচ্ছে। এমন কি একটু-আধটু হাসতেও হচ্ছে। উৎসব মিটতে বিকেল গড়িয়ে গেল। শরীরের ওপর দিয়ে যেন ঝড় বয়ে গেল এক প্রস্থ। ঊর্মিলা দাঁড়াতেও পারছে না আর। সন্ধ্যা হতে না হতে শয্যার আশ্রয় নিল।

খানিক বাদে শৈলবালা এলেন। ঊর্মিলার ক্লেশটুকু অনেকক্ষণ ধরেই উপলব্ধি করছিলেন তিনি। কপালে হাত রাখলেন। গায়ে তাপ উঠেছে। ঊর্মিলা চোখ মেলে তাকালো। পরে দুই হাতে মুখ ঢেকে ফুপিয়ে কেঁদে উঠল।

নিশানাথ কলকাতায় এসেছে। কিন্তু অকারণে নয়। বিদেশ থেকে ফিরে মহেশপুরে যাবার মুখে কলকাতার তিনটি নামকরা মেডিকেল ক্লিনিকের সঙ্গে সে যোগাযোগ করে গিয়েছিল। এখন রিপোর্টগুলো নিতে হবে। আগেও অনেকবার নিয়েছে। কিন্তু শেষ বারের মত নিঃসন্দেহ হওয়া ভালো। এক জায়গা থেকে নয়, তিন জায়গা থেকে।

রিপোর্ট সংগ্রহ হল। না, ভুল নেই। ভুল থাকবে না জানা কথাই। বিদেশেও নামী চিকিৎসা-বিজ্ঞানীকে দিয়ে নিজেকে যাচাই করে নিয়েছে। এবারেও তিনটে রিপোর্ট থেকে সেই একই তথ্য আহরণ হল।

....সন্তান-সম্ভাবনা নেই তার।

...তবু বংশধর আসছে!

এই বার নিশানাথ ধীরে-সুস্থে কাজের কথা ভাবতে লাগল। কি করবে সে? কিছু একটা করবেই।...কিন্তু কি করবে?

তিন দিন বাদে মহেশপুরে পৌঁছেও ঠিক করতে পারল না কি করবে। পশুপতিনাথের ছেলে সে। একেবারে নির্মূল করে দেবে বংশধর-বহনকারিনীকে সুদ্ধু? কিন্তু তার পরেও বাকি থাকে। বাকি থাকে শশাঙ্ক। তাকে কি করবে?...গুলী করে মারবে?...জীবন্ত পুঁতবে? হঠাৎ নিশানাথের মনে হল যেন অন্য রকম রক্ত বইছে তার ধমনীতে। পশুপতিনাথের রক্তে বুঝি মরচে পড়েছিল এতকাল!

সাক্ষাৎমাত্রে তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে উর্মিলা বলে উঠল, এসবের অর্থ কি, আমি জানতে চাই?

উঠে বসার ক্ষমতা নেই। জ্বরও ছাড়েনি। কাঁপছে থর-থর করে। শরীর বিষিয়ে যাচ্ছে তিলে তিলে। তবু উঠে বসল, মাথা সোজা রাখল।

নিশানাথ শান্ত। দেখছে। কুৎসিত, বীভৎস। এই নারীদেহ সে ভালোবেসেছিল একদিন! আশ্চর্য!

কি জানতে চাও, বংশধর আসছে শুনেও আনন্দে লাফালাফি করছিনে কেন?

আনন্দ যে হয়নি তোমার দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু কেন হয়নি? চাওনা তুমি?

ঊর্মিলা যেন একটা পথ দেখিয়ে দিল নিশানাথকে। হ্যাঁ, সন্তান সে চায় বই কি। সন্তান চায়, বংশধর চায়। যে আসছে আসুক। নিশানাথের সন্তান। দত্তবাড়ির বংশধর। সে থাকবে। ···কিন্তু ঊর্মিলা থাকবে না। ···আর থাকবে না শশাঙ্ক।

হিংস্র আনন্দে নিশানাথ মুখ তুলে তাকালো। সে দিকে চেয়ে ঊর্মিলা অকস্মাৎ ভয়ে বিমূঢ় হয়ে গেল যেন। মানুষের এমন শ্বাপদ-চক্ষু আর কখনো দেখেনি।

পরদিন খুব সকালেই নিশানাথ বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। কোন উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, এমনি। কিন্তু এক সময় কি ভেবে একটা নির্দিষ্ট পথ ধরল সে।

শশাঙ্ক বাড়িতেই ছিল। নিশানাথকে দেখে কোনরকম অভ্যর্থনা না করে নীরবে তাকালো।

নিজেই একটা চেয়ার টেনে বসল নিশানাথ। বেশ স্বাভাবিক ভাবেই বলল, তুমি বউদিকে বলে এসেছ শুনলাম গরজ থাকলে যেন বাড়ি এসে দেখা করি। গরজ আছে।—তোমার কিছু ধন্যবাদ পাওনা হয়েছে। সেটা দেব। আর আমার কিছু কৈফিয়ৎ পাওনা আছে ···সেটা নেব।

শশাঙ্ক এবারেও একটি কথাও বলল না।

নিশানাথ বলল, আমি যখন ছিলুম না, শুনলাম তুমি তখন আমার স্ত্রীর খোঁজ-খবর করেছ, ডাক্তার দেখিয়েছ, ওষুধ-পত্র এনে দিয়েছ, ধন্যবাদটা সেই জন্য।

শশাঙ্কর মুখে ক্রোধের রেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবু চুপচাপ অপেক্ষা করে সে।

নিশানাথ একটু অপেক্ষা করে আবার বলল, জাপানে থাকতে

তোমার একটা চিঠি পেয়েছি। স্ত্রীর প্রতি আমার কর্তব্যে ত্রুটির জন্য অভদ্র অপমানকর চিঠি লিখেছ। পশুপতিনাথের ছেলে কারো গালাগালি শুনে বা গরম চক্ষু দেখে অভ্যস্ত নয়। এর জবাব দিতে হবে।

শশাঙ্কর চোখের সমুখে হঠাৎ যেন একটা রহস্য উদ্ঘাটিত হল। দিদি সে দিন তাকে নিয়ে দূরে কোথাও চলে যাবার জন্য আকুতি মিনতি করেছিলেন। আজ নিশানাথের দিকে চেয়ে তার মনে হল, দিদি ওকে নিয়ে যেতে চাইছিলেন তার নিজের কোনো অশান্তির কারণে নয়, এই লোকটার হাত থেকে তাকেই রক্ষা করবার জন্য। কিন্তু কেন! কিন্তু কেন? তীক্ষ্ণধী মানুষটির কাছে কি একটা আভাস যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল। চেয়ে আছে, দেখছে।

ধীরে-সুস্থে বলল, জবাব যদি দিই, প্রবল-প্রতাপ পশুপতিনাথের ছেলের কি সেটা ভালো লাগবে? আমার একমাত্র জবাব হতে পারে, ওই যে বাগানে চাকরটা আর দুটো মালী কাজ করছে, তাদের ডেকে পশুপতিনাথের ছেলেকে রাস্তা দেখিয়ে দিতে বলা।

নিশানাথের চোখে সেই হিংস্র আগুন জ্বলে উঠল আবার। মনে হল, এক্ষুনি বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে মানুষটাকে। কিন্তু সামলে নিল।—নিঃশব্দে উঠে চলে গেল তারপর।

অন্দর মহলে প্রথমেই শৈলবালার সঙ্গে দেখা। বলল, শশাঙ্কর সঙ্গে দেখাটা করে এলাম।

মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলেন শৈলবালা। নিশানাথ পাশ কাটালো। হাসছে মনে মনে। সত্যটা শৈলবালার কাছেও গোপন নেই তাহলে! কুশাগ্র-বুদ্ধি শৈলবালার।

কি ভেবে ফিরে এলো নিশানাথ। বাইরের ঘরে এসে আরাম কেদারায় গা ছেড়ে দিল। উর্মিলার সামনে এ সময়ে যাওয়া উচিত নয়। একটা কিছু করে ফেলতে পারে। ওর নীল রক্তের নীল আগুন ক্রমশঃ যেন মাথার দিকে উঠছে। হত্যা করতে হবে। মাথায় হত্যার জল্পনা-কল্পনা চলছে সেই থেকে। উর্মিলা হাতের মুঠোতেই আছে। কিন্তু শশাঙ্ক? বিগত দিনের শিকার-পর্বে গুলীতে কাঁধের ব্যাগ ফুটো করে দেওয়া, আর ওর সেই ঠোঁট-কাঁপুনির দৃশ্যটা মনে পড়তে নিশানাথের হাসি পেল। নির্মম ক্রুর হাসি।

হঠাৎ চেঁচামেচি শুনে সচকিত হল। তার মা হাউ-মাউ করে এসে কেঁদে পড়লেন।—হ্যাঁ রে, বউটাকে কি মেরে ফেলবি? কি হল তোর? ওদিকে যে অজ্ঞান হয়ে আছে সেই থেকে সারা অঙ্গ নীল বর্ণ।

শুনে নিশানাথ নিস্পৃহ মুখে বললে, ডাক্তারকে খবর দিতে বলো।

হা রে পোড়াকপাল, ডাক্তার কি আর এখানে! শশাঙ্ককে খবর পাঠিয়েছি এক্ষুনি তাকে ধরে নিয়ে আসার জন্যে। কিন্তু কি হবে, পেটের সন্তান বাঁচবে তো? তোর কি হল? তুই একবার এসে দেখে যা না?

শশাঙ্ককে ডাক্তার ডেকে আনার জন্যে খবর দেওয়া হয়েছে শুনেই নিশানাথ গর্জে উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু পরের কথাগুলো কানে যেতেই সে তড়িত-স্পৃষ্টের মত উঠে দাঁড়াল। উর্মিলা যায় যদি যাক। একটা হত্যার দায় কমবে। কিন্তু যে আসছে তার না বাঁচলে নয়।

তৎক্ষণাৎ অন্দর মহলে এলো। শয্যায় চোখ বুজে পড়ে আছে উর্মিলা। শৈলবালা চোখে-মুখে জলের ছিটে দিচ্ছেন। নিশানাথ তাড়াতাড়ি আর একজন কর্মচারীকে ডাক্তারের কাছে পাঠালো।

প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে ডাক্তার এলেন। নিশানাথ লক্ষ্য করে দেখল, তিনি একাই এসেছেন, সঙ্গে শশাঙ্ক নেই। কিছুক্ষণ বাদে রোগীণী পরীক্ষা করে চিকিৎসক হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন। নিশানাথের নীরব প্রশ্নের জবাবে শুধু বললেন, এক্ষুনি ঘুরে আসছেন। গাড়িতে উঠে তীর বেগে প্রস্থান করলেন তিনি। ফিরলেন আরো ঘণ্টাখানেক পরে। কিন্তু একা নয়। শহরের একজন নামজাদা সার্জেনকে সঙ্গে নিয়ে।

একসঙ্গে আবার রোগিণী দেখলেন তাঁরা। তাঁদের কথাবার্তা দুর্বোধ্য লাগছে নিশানাথের। শেষে তাকে আড়ালে ডেকে তাঁরা যা বললেন, তার মর্মার্থ—এক্ষুনি অপারেশন করতে হবে, পেটে যা আছে সেটা সন্তান নয়, জরায়ুতে টিউমার জাতীয় কিছু। ঠিক শিশুর মতই সেটা আস্তে আস্তে বাড়ে, আর অনেক লক্ষণই হুবহু মিলে যায়। বিশেষ করে, রোগিণীর সন্তান-কামনা বেশি হলে এ লক্ষণ-গুলো আরো সুস্পষ্ট হয়ে থাকে। এ রোগ হলে প্রথম কিছু কাল পর্যন্ত চিকিৎসকেরও ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। রোগিণীর প্রথম যখন জ্বালা-যন্ত্রনা সুরু হয়, তখনই খবর দেওয়া উচিত ছিল। বাঁচার আশা কম, তবে এখনো একবার চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

নিশানাথ কি শুনছে, কোন্ প্রস্তাবে ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিচ্ছে, কিছুই হুঁস নেই।···আবার এক সময় দেখল, গাড়ি-বোঝাই যন্ত্র-পাতি এলো। ডাক্তার ছাড়াও সহকারী এলেন দু'জন, দু'জন নার্সও। দেখতে দেখতে তার ঘরটার ভোল বদলে গেল যেন। ডাক্তার প্রস্তুত হলেন। সহকারীরা প্রস্তুত হলেন। নার্সরাও প্রস্তুত। অপারেশান করবেন যে সার্জেন তিনি এবার ইশারায় নিশানাথকে ঘর ছেড়ে চলে যেতে বললেন। কিন্তু ঘরের কোণে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল

নিশানাথ। অপর ডাক্তার এসে অনুরোধ করলেন। সে নড়ল না। ডাক্তার সার্জেনের কাছে গিয়ে চুপি চুপি বললেন কি যেন।

নিশানাথ বিমূঢ় নেত্রে দেখছে চেয়ে চেয়ে। উর্মিলাকে ধরাধরি করে টেবিলে তোলা হল। অসময়ে যাতে জ্ঞান ফিরে না আসে সম্ভবত সেই ব্যবস্থা হচ্ছে এখন।···সার্জেনের হাতে একটা ঝক্‌ঝকে ছুরি ঝকমকিয়ে উঠল। তার পরেই দু'চোখ বুজে ফেলল নিশানাথ। ছুরিটা সমূলে যেন তারই দেহে বিদ্ধ হয়ে জঠর-দেশ দু'খানা করে চিরে দিয়ে গেল। অব্যক্ত যাতনায় চোখ মেলে তাকালো সে। টেবিলে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটেছে! উন্মুক্ত, বীভৎস দৃশ্য! সার্জেনের আচ্ছাদনে ঢাকা মোটা মোটা হাত দুটো যেন রক্তে অবগাহন করছে।

নিশানাথের গা ঘুলিয়ে উঠল। পা টলছে। মাথা ঘুরছে। দু'হাতে মুখ চেপে ধরে কাঁপতে কাঁপতে বাইরে এসে রেলিংএ মাথা রাখল। অনেকক্ষণ পড়ে রইল তেমনি। মাথা তুলল আবার। কিন্তু পিছন ফিরে ঘরের দিকে তাকাবার সাহস নেই আর। এক'পা দু'পা করে সামনের দিকে এগোলো সে।

কিছুক্ষণ।

যেন বহুক্ষণ। আত্মবিস্মৃতের মত নিশানাথ এ-ঘর ও-ঘর করছে। মায়ের ঘরে গেল। প্রণামের ভঙ্গীতে উবুড় হয়ে পড়ে আছেন তিনি। নিশানাথ বেরিয়ে এলো। শৈলবালার ঘরে গেল। পাথরের মূর্তির মত বসে আছেন তিনি। ওকে দেখে আর এক দিকে মুখ ফেরালেন। নিশানাথ বেরিয়ে এলো। নিজের অজ্ঞাতেই সিঁড়ি ভেঙ্গে নিচে নেমে এলো সে।

উঠোনের এক পাশে শশাঙ্ক দাঁড়িয়ে।

এগিয়ে গেল। কাছে। আরো কাছে। খুব কাছে। একেবারে

তার বুকের কাছে। হঠাৎ দু' হাত বাড়িয়ে তাকে সবলে আঁকড়ে ধরে ওর কাঁধে মুখ গুঁজে ছোট ছেলের মত ডুকরে কেঁদে উঠল সে।

ও দিকে শশাঙ্কও চোখে ঝাপসা দেখছে সব কিছু।

মাশুল

শীতের ধোঁয়াটে রাত্রি। কন-কনে ঠাণ্ডা হাওয়া হাড়ের ভেতর সেঁধোয়। আবছা অন্ধকারে সেই থেকে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে জয়ন্ত। লক্ষ্য, ফুটপাথের ওধারে জীর্ণ তিনতলা বাড়িটার দিকে। দাঁতের ফাঁকে অর্ধ-দগ্ধ চুরুট জ্বলে জ্বলে নিভে গেছে। অন্তর্দ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত।

যাবে ?

যাবে না ?

যাবে ?

কিন্তু এরই নাম মুক্তি ? নয়ই বা কেন। উষ্ণ ঘন পিচ্ছিল বিস্মৃতি…। মূল্য দিয়ে কিনতে হয়। কোথায় নেই এই দেনা-পাওনার বোঝাপড়া। সঞ্চয়ের তবিল স্ফীত নয় বলেই তো আজ এই নিঃসঙ্গ শীতের রাতেও ওর প্রতীক্ষায় বসে নেই কেউ।

অযোগ্যতা··· ?

যোগ্যতার মাপকাঠিতে দুনিয়া চলে ? ওই যে তিনতলার ছোট ঘরে বসে আছে মেয়েটি, যে-কোনো আগন্তুকের প্রতীক্ষায়, কোন্ যোগ্যতার অভাব ছিল তার ! সুশ্রী নম্র বুদ্ধিমতী···। কিন্তু বিধি-লিপি এমন কেন ?

পানের দোকানের পাশে ছোট অপরিসর গলির মধ্য দিয়ে প্রবেশপথ। আশেপাশে ভদ্রলোকের বসতি। এমন কি এ বাড়ির পাঁচ মিশালি বাসিন্দাদের মধ্যেও গরীব গৃহস্থ আছে দু'চার ঘর। ভুল করে কোনো আগন্তুক যদি তাদের দরজায় ঘা দেয়, আধ-বয়সি গৃহস্থ বউ দরজা খুলে নিস্পৃহ মুখেই জানিয়ে দেবে ভুল জায়গায় এসেছে।

দু'তিন দিনের যাতায়াতে বাড়িটার আনাচ-কানাচ চেনা হয়ে

গেছে জয়ন্তর। ভাঙ্গা সিঁড়ি ধরে সোজা উঠে যাবে তিনতলায়। সামনের সরু অন্ধকার বারান্দার এক কোণে রেলিং ঘেঁষে বসে আছে বুড়ি ঝি। বয়সের ভারে দেহ সামনের দিকে নুয়ে পড়েছে। আফিং খেয়ে ঝিমোয় সারাক্ষণ। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা মাত্র তার দুমড়নো শিরদাঁড়া সোজা হবে। অন্ধকার ভেদ করে ঘোলাটে দুটো চক্ষুকোটর সংবদ্ধ হবে আগন্তুকের মুখের ওপর। আস্তে আস্তে দেহ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়বে আবার। বিড় বিড় করে বলবে, ভিতরে যান, ঘরে আছে—।

ব্যতিক্রম ঘটল। এই দারুণ শীতেও স্যাঁতসেঁতে সরু বারান্দায় বুড়ি বসে আছে ঠিকই। কোলে কম্বল জড়ানো পুঁটুলির মত একটা কি। অন্ধকারে জয়ন্ত ঠাওর পেল না। বুড়ি তেমনি মুখ তুলে দেখলে ওকে, বলল, বাইরে গেছে, ঘরে গিয়ে বসুন।

অপ্রত্যাশিত নিরাশা। কি করবে ঠিক করে উঠতে পারছিল না জয়ন্ত। বুড়ি আবার বলল, সামনেই দোকানে গেছে, এক্ষুণি আসবে, ঘরে গিয়ে বসুন—।

প্রায় আদেশের মত শোনায়। ওই একটি মাত্র ঘর তিনতলায়। ভিতরে প্রবেশ করে জয়ন্ত দরজাটা ভেজিয়ে দিল আবার। বুড়ির দৃষ্টির নাগালের কাছে থাকাটাও অস্বস্তিকর। সুপরিচ্ছন্ন ছোট ঘর। ধপ ধপে বিছানা পাতা। দেয়ালের গায়ে গোটা কতক দেবদেবীর মূর্তি। ঘরের অধিবাসিনীর ফোটোও আছে একটা। নাম নীলা।

বসে আছে জয়ন্ত। খুশির আমেজ লাগছে যেন। একটু বিরক্তিও। যেন নিজের ঘরটিতে বসে আছে সে, আর তারই নিতান্ত আপন কেউ বলা নেই কওয়া নেই নিশ্চিন্ত মনে বাইরে ঘুরছে কোথায়। এত শীতে ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করাও তো বিচিত্র নয়।

লঘু পদধ্বনি। কণ্ঠস্বরও শুনল একটু বাদেই, মা গো কি শীত বাইরে, একি ! এই ঠাণ্ডায়....

বুড়ির শীতল কণ্ঠে বাধা পেয়ে থেমে গেল !—একজন বাবু বসে আছে ঘরে।

জয়ন্ত উৎকর্ণ। অনুচ্চ কণ্ঠের তর্জন শোনা গেল, পারিনে আর, যেতে বলে দিলে না কেন—!

বুড়ি ততোধিক শান্ত—জয়ন্তবাবু অনেকক্ষণ বসে আছে, ঘরে যা—।

মর্যাদাটুকুর অর্থ স্পষ্ট ও নগ্ন। আফিংখোর বুড়ি ঝিও জয়ন্তর দুর্বলতার খবর জানে। বাদানুবাদ দূরে থাক, গেল বারে কত দিল না দিল ভালো করে না দেখেই সে পালিয়েছিল। একটু আগের খুশির ভাবটুকু কেটে গেল। বিকৃত হাসি দেখা দিল মুখে, প্রতিমুহূর্তের অভ্যর্থনা এখানে মূল্য দিয়ে কিনতে হয় জেনেই তো আসা।

আস্তে আস্তে ঘরে প্রবেশ করল মেয়েটি। দরজা আবজে দিল। গায়ের গরম আলোয়ানটা আলনায় রাখল। মুখোমুখী ঘুরে দাঁড়াল তারপর।

জয়ন্ত দেখছে। অভিসারিকার বেশ নয়, শাদাসিধে আটপৌরে সাড়ি, ব্লাউজ। দোকানে যাওয়ার কথাটা বুড়ি বানিয়ে বলেনি হয়ত।

অনেকক্ষণ বসে আছেন তো ?

জয়ন্ত স্থির, শান্ত। দেনা-পাওনার সম্পর্কটা আজ ভুলবে না কিছুতে। বলল, ঝি যেতে বলে দেয়নি, তুমি বললেও তো পারো।

তার পাশ ঘেঁষে বসল নীলা। বলল, বাবা, এও কানে গেছে ! কিন্তু আপনার নাম শুনে তো আর কিছু বলিনি—।

অন্য দিনের মত আজ আর গল্প জমল না। জয়ন্তর ভাবুক

মনের তাল কেটেছে। শুধু তাই নয়, নীলাকেও অন্যমনস্ক দেখছে কেমন। অন্যদিন ও অনভিজ্ঞ অতিথির বিপর্যস্ত হাবভাব লক্ষ্য করেছে নিঃশব্দ কৌতুকে। আজ নিজের অজ্ঞাতে বন্ধ দরজার দিকে ফিরে তাকাচ্ছে বারবার। হঠাৎ জোর করেই একটা হাই তুলে নীলা বলে ফেলল, ঘুম পাচ্ছে···।

মুহূর্তে দু'চোখ জ্বলে উঠল জয়ন্তর। এও ত' যেতে বলারই নামান্তর। অর্থাৎ যত শীগ্‌গির পারো টাকা দিয়ে বিদেয় হও। কিন্তু আজ জয়ন্তও করবে দোকানদারী।

নির্মম দৃঢ় নিষ্পেষণে সে কান পেতে শুনতে চাইল ওর বুকের উষ্ণ স্পন্দন। বদলে বাইরে থেকে হঠাৎ কানে এলো শিশুর সুস্পষ্ট গোঙানির শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে নীলা চমকে উঠল যেন।

কী—?

নীলা জবাব দিল, কিছু না।

পরক্ষণে আবারও। এবারে কাতর কান্না। বাইরে বুড়ি ঝির তাকে থামাবার চেষ্টা। ঘরে দুই সবল বাহুর মধ্যে নীলার অস্বস্তি।

জয়ন্ত উঠে বসল।—বাইরে কাঁদছে কে?

নীলা থতমত খেয়ে গেল কেমন।

কে কাঁদছে বাইরে?

মেয়ে।

কার মেয়ে?

আমার।

জয়ন্ত নির্বাক! দুই চোখে নির্বোধ বিস্ময়। বুড়ির কোলে পুঁটলির দৃশ্যটা মনে পড়ে। এই প্রচণ্ড শীতে ঘরের মধ্যে জায়গা হয়নি।····একটি মাত্র ঘর।

কত বড় মেয়ে ?

দেড় বছর ··।

অন্য দিন তো দেখিনি ?

একটু চুপ করে থেকে নীলা বলল, নিচের তলায় একজন ভাড়াটের কাছে থাকত···।

জয়ন্তর সমস্ত দেহে কি একটা শীতল পদার্থ যেন ওঠানামা করছে। গম্ভীর মুখে আদেশ দিল, ঘরে নিয়ে এসো।

নীলা হকচকিয়ে গেছে আগেই। উঠে আস্তে আস্তে দরজা খুলে বাইরে গেল। জয়ন্ত কান পেতে শুনল, বুড়ি ঝি ফিস ফিস করে বলছে,—জ্বরে গা পুড়ে গেল, কতক্ষণ আর ঘুমুবে !

নীলার অন্যমনস্কতা, ঘুম পাওয়া, কান্না শুনে চমকে ওঠা, সব কিছুর অর্থ সুস্পষ্ট হল এতক্ষণে। হাসি পাচ্ছে জয়ন্তর। নির্মম, নিষ্করুণ হাসি। মেয়েদের মাতৃত্ব-বোধ বিধাতার সকলের বড় আশীর্বাদ ····সকলের বড় অভিশাপও নয় কেন ?

মেয়ে কোলে নীলা ফিরে এলো। বুকের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে বসল চৌকির ওপর। জয়ন্ত চেয়ে আছে বিস্ফারিত নেত্রে।···· একমাথা অবিন্যস্ত কোঁকড়া চুল, শীতে আর জলো হাওয়ায় গাল দুটো ফেটে দগদগে লাল হয়ে গেছে! পাতলা বিবর্ণ দুই ঠোঁট থেকে থেকে কেঁপে উঠছে থরথর করে। নইলে আর পাঁচটি শিশুর মতই সুন্দর।

জ্বরের ঘোরে বেহুঁস হয়ে পড়েছে আবার; বুকের সর্দিতে প্রতিটি শ্বাসের ঘড় ঘড়ানি শুনতে পাচ্ছে জয়ন্ত। ওর বুকের ভেতরটাও কে যেন নিংড়ে দুমড়ে একাকার করে দিল হঠাৎ। বিকৃতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, ওষুধ দিয়েছ কিছু ?

আনতে গিয়েছিলাম, দোকান বন্ধ।

অনুচ্চকণ্ঠে জয়ন্ত ধম্‌কে উঠল, এ তো আর তোমার দোকান নয় যে সারা রাত খোলা থাকবে, আগে কি করছিলে ?

নীলা শান্ত মুখে তাকাল তার দিকে,—আগে টাকা ছিল না।

আর সাড়া শব্দ নেই। জয়ন্ত নির্বাক নিস্পন্দ।...মৃতকল্প শিশুর জায়গা তখনো ছিল বাইরের অন্ধকারে ওই স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডায়, বুড়ির কোলে। এই একটি মাত্র ঘর ওষুধের টাকা জুগিয়েছে। কিন্তু দোকান তখন বন্ধ। দরজার দিকে চোখ পড়তে জয়ন্ত দেখল, বুড়ি দাঁড়িয়ে আছে নিঃশব্দে। ঘরে ঢুকল। খানিক নীরব থেকে ঘরের পরিস্থিতি অনুভব করল যেন। টানা গলায় নীলাকে বলল, ঘুমিয়ে পড়েছে, দে নিয়ে যাই।

নীলার বিব্রত দুই চোখ পড়ে সামনের মানুষটার দিকে। কপাটির কাছটায় দপদপ করছে জয়ন্তর। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল চৌকি ছেড়ে। জ্বলন্ত দৃষ্টি বুড়ির মুখের ওপর। বুড়িও চেয়ে আছে তার দিকে।...নির্বিকার, নিস্পৃহ। মড়ার মত ঘোলাটে চোখ দুটো যেন হেসেও উঠল একবার। খুক খুক করে কাশতে কাশতে বাইরে চলে গেল বুড়ি।

অকস্মাৎ একটা সন্দেহ সজোরে নাড়া দিল জয়ন্তকে। তাকালো নীলার দিকে।—ওই বুড়ি কে ?

নীলা ভয় পেয়ে গেছে। শুকনো মুখে চকিতে দরজার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল একবার।

কে, ও ?

মা।

ঘর ফাটিয়ে আবার হেসে উঠতে ইচ্ছে করছে জয়ন্তর। ঠিকই

অনুমান করেছিল। নীলা বসে আছে মূর্তির মত। চোখের সামনে সবকিছু ঝাপসা দেখছে জয়ন্ত।....বিশ বছর, পঁচিশ বছর পরের একটা সম্ভাবনা ভাসছে। সামনের তাজা নারী দেহ মিলিয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে। তার বদলে বসে আছে পলিতকেশ লোলচর্ম এক জরাজর্জর বৃদ্ধা, কোলে তার নতুন কোনো আধমরা শিশু, মাথার ওপরে ছাদ নেই, ভিজে স্যাঁতসেতে শীতের হাওয়া—সামনের দরজা বন্ধ।...নগ্ন প্রত্যাশার উল্লাসে সেখানে ধক ধক, ধক ধক করছে এক আদিম নর-দানবের জ্বলন্ত হৃৎপিণ্ড—নির্মম, নৃশংস, মাংস-লোলুপ।

তিলে তিলে তিলোত্তমা

আজব শহরের আজব বাহার!

ঘড়ি ধরে সন্ধ্যা ছ'টায় খোলে, ন'টায় বন্ধ হয়। আশেপাশে প্রায় সকাল ছ'টা থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত যাদের দোকান খোলা, তারাও তখন এদিক পানে চেয়ে থাকে, আর বড় বড় নিঃশ্বাস ছাড়ে। প্রাসাদোপম এই অট্টালিকায় অনেক ব্যবসায়ী অনেক রকমের ব্যবসা ফেঁদে বসেছে। কিন্তু বিউটি হাউসের তিন ঘণ্টা ওদের তিরিশ ঘণ্টা।

'সব রাস্তা রোমের দিকে।' এখানে সব আগন্তুক বিউটি হাউসের দিকে।—স-সঙ্গিনী তিন ঘণ্টা সিনেমায় কাটানো যায়, লাভার্স পার্কের আবছা আলোয় নিরিবিলিতে বসে তিন মিনিটে তিন ঘণ্টার অবসান হতে পারে, হাত ধরা ধরি করে শিথিল চরণে মার্কেট প্লেসের শো-কেইস দেখেও ঘণ্টা তিনেক উতরে দেওয়া যায়। কিন্তু এখানকার এই তিন ঘণ্টার স্রোত একেবারে অন্য খাতে বইছে। এই তিন ঘণ্টায় মনো-বৈচিত্র্যের নিখুঁত নক্সা আঁকতে পারে, এমন লিপি-বণিক জন্মায় নি বোধ হয়।

রূপ-চর্যার জীবন্ত মিছিল।—বিধাতার মার হার মেনেছে বিউটি হাউসের মার-প্যাঁচের কাছে। খোদার ওপর খোদকারীর নমুনা দেখাচ্ছে বিউটি হাউস। বিউটি হাউস মুশকিল-আসান।

নারীপুরুষের বিচ্ছিন্ন সমাগম। সঙ্গী বা সঙ্গিনী নিয়ে বড় কেউ আসে না এখানে। অন্যের চোখে নিজেকে অভিরাম করে তোলার তাগিদে কোঅপারেশন অচল।

প্রকাণ্ড হল্। শাদা আলোয় মেঝেতে পুরু কার্পেটের রোঁয়া

পর্যন্ত দেখা যায়। এক দিকে সারি সারি শো-কেইসএ রঙ-বেরঙের প্রসাধন-সামগ্রী সাজানো। সে সবের উপযোগিতা আর ব্যবহার বুঝিয়ে দেবার জন্য আছে এক্সপার্ট সেলস্‌ম্যান। অন্য দিকে ছোট ছোট চেম্বার। হাতে-কলমে কলা-কৌশল শেখানোর মহড়া চলেছে সেখানে।

বয়সের ভারে কোঁচকানো চামড়ায় যৌবনের জলুস আনা যেতে পারে।···কালোর চেকনাই ছোটানো যেতে পারে শাদা চুলে।···তোবড়ানো গাল ভরাট দেখাবার উপকরণ পেতে হলে এখানে আসতে হবে।···এখানে আসতে হবে প্লাস্টার-পালিশে বাঁকা-চোরা বিকৃত দাঁতে কুন্দ-দন্তের শোভা আনার কৌশলটি জানতে হলে। পটলচেরা চোখ বা কোঁকড়ানো চুল চাই তো এসো বিউটি হাউসে। আর রঙ কালো ?···ওতেই স্পেশ্যালাইজ করেছে বিউটি হাউস।—শুধু এখানকার উপকরণ আর পনের দিনের ট্রেনিং—এর পরে মুখের ওপর সার্চ-লাইট ফেললে প্রসাধন যদিও বা ধরা পড়ে, আসল রঙটি ধরা যাবে না। শোনা যায়, এ বিদ্যে শেখানোর জন্য প্যারিস থেকে ট্রেইনার ধরে এনেছে দোকানের মালিক ভাট্‌নগর। নিরুৎসুক জনের খটকা লাগতে পারে, যে-দেশে কালো রঙের সমস্যা নেই, সে দেশে অমন এক্সপার্ট গজায় কি করে ? কিন্তু নিরুৎসুক জনকে নিয়ে কারবার নয় বিউটি হাউসের।

চটপটে ছটফটে মানুষ ভাট্‌নগর। হাসছে গল্প করছে তদবির তদারক করছে। নতুন খদ্দের দেখলেই বিলিতি কায়দায় মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানায়, সাদরে নিয়ে গিয়ে বসায় নিজের নিরিবিলি বসবার জায়গাটিতে। গভীর সহানুভূতিতে সমস্যা

শোনে, মাথা নাড়ে। সম্ভাব্য সমাধান বাতলে দিয়ে আশ্বস্ত করে তার পর। সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের গায়ে লাগানো বোতাম টেপে। প্যাঁ-ক করে শব্দ হয় একটা। বেয়ারা দৌড়ে আসে।

—সাব্‌কো (অথবা মেমসাব্‌কো) ···· নম্বর কামরা দেখাও।

পুরানো বা চেনা-জানা খদ্দেরের সঙ্গে তার হাসি-খুশি ভরা অন্তরঙ্গতায় ব্যবসায়ীর দূরত্ব নেই এতটুকু। কোনো ভদ্রলোকের কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে সোচ্ছ্বাসে বলছে, গ্রোইং ওয়ানডারফুলি ইয়ং স্যার! উত্তরতিরিশ কোনো মহিলাকে সবিনয় অভিবাদনে স্তুতি জানাচ্ছে, ইউ লুক হার্ডলি টুয়েন্টি মাদাম্—!

যার রূপ আছে সেও আসে। যতটুকু আছে তার থেকে বেশি একটু থাকতে আপত্তি কি! আর যার নেই তার তো কথাই নেই। কিন্তু সবাই যে এখানে এসে একেবারে রূপচয়নে বসে যায় বা তেমনি কোন সমস্যা নিয়ে হাজির হয় এমন নয়। সাধারণ প্রসাধণ-সম্ভারও হরদম বিক্রি হচ্ছে এখানে, যা আজকাল ঘরে ঘরে লাগে। সে সব কেনার ছুতোয় কৌতূহল মেটাতে আসে অনেকে।

কিন্তু আরো একটা আকর্ষণ আছে বিউটি হাউসের।

স্বপ্না বোস।

দীপ-শিখা যেমন পতঙ্গ টানে তেমনি ওরও অমোঘ একটা আকর্ষণ আছে। পিছনের দরজা দিয়ে গট্ গট্ করে ঢোকে যখন, মনে হয় এত বড় হল্‌টা ঝলমলিয়ে হেসে উঠল।

বিউটি হাউসের প্রধানা আপ্যায়িকা স্বপ্না বোস।

কিন্তু অন্তরঙ্গ সকলেরই বিশ্বাস, শুধু কর্মচারিনী নয়, ব্যবসায়ের কলকাঠিও এই মহিলাই আগলে বসে আছে। আর ধারণা, স্বপ্না বোস ছাড়া ভাটনগরের জীবন-জোয়ারেও চড় চড় করে ভাটা নেমে

আসবে। অনেকের ইঙ্গিত আরো স্পষ্ট। বোস পদবীটা এখনো রেখেছে ব্যবসায়ের আবহাওয়ায় রোমান্স ছড়াবার জন্য, নইলে, ইত্যাদি।

আশ্চর্য, মেয়েদের সঙ্গে পর্যন্ত ভারি সহজ একটা হৃদ্যতা ওর—যা হবার কথা নয়। তারা আসে রূপচয়ন করতে। এ নারী রূপেরই জীবন্ত উৎস। ঈর্ষা হবার কথা, কিন্তু হয় না। বরং শলা-পরামর্শ নির্দেশ-উপদেশের জন্য ওরই কাছে মন খুলে দেয় তারা। ওকে দেখে আপন অভিলাষ ব্যক্ত করতে নবাগতদের হয়ত একটু সঙ্কোচ হয়, হয়ত বা ওর দিকে চেয়ে চেয়ে চাপা নিঃশ্বাসও পড়ে দুই একটা। কিন্তু যাদু জানে স্বপ্না বোস। হেসে, জড়িয়ে ধরে, কানে কানে কথা বলে, নিরিবিলি চেম্বারে টেনে নিয়ে গিয়ে মনের কথা শুনে আর মনের মত কথা শুনিয়ে বৈষম্যের অনুভূতিটুকু পর্যন্ত ধুয়ে মুছে দেয়।

পুরুষদের সঙ্গে অবশ্য স্বপ্না বোসের রীতি-নীতি ভিন্ন। এদের মধ্যে সমস্যা নিয়ে যারা আসে, তারা আর যাই হোক ওর কাছে আসে না। তারা সোজা যায় ভাট্‌নগরের কাছে, নয়ত তার অন্য কোনো পুরুষ সহকারীর কাছে। কিন্তু স্বপ্না বোসের সঙ্গ-অভিলাষী আগন্তুকের সংখ্যাও কম নয়। বারমাস তিরিশ দিনের প্রসাধন সামগ্রীই হয়ত কিনতে আসে তারা। একের জায়গায় তিন গছিয়ে দেয় স্বপ্না বোস। কৃত্রিম বিপন্ন ভাবটি ফুটিয়ে তুলে তারা হয়ত বলে, বাঃ রে, এত কি হবে ?

নিয়ে যান, বউ খুশি হবে।

বউ খুশি হোক না হোক আর কেউ যে খুশি হবে, সেটা জেনেই ওরা খুশি।

কাউকে বা স্বপ্না বোস ছদ্ম-কোপে ঝাঁঝিয়ে ওঠে, আপনারা না নিলে আমাদের দোকান চলে কি করে ?

ওদের দোকান সচল রাখতে গিয়ে নিজে অচল হচ্ছে কি না, সেটা তখনকার মত অন্তত অনেকেরই মনে থাকে না।

বাড়ি-গাড়িঅলা সুপরিচিতদের ছদ্ম-ত্রাস জড়িত অন্তরঙ্গতার সুরও বৈচিত্র্যহীন নয়।—বাঃ রে, এলেই এক কাঁড়ি জিনিস নিতে হবে তার কি মানে আছে, গরীব মানুষ অত টাকা কোথায় পাব ?

স্বপ্না বোস কখনো একঝলক হেসে ফস করে জবাব দেয়, তবে দোকানে আসেন কেন ? কখনো বা তেমনি ছদ্ম-গাম্ভীর্যে বলে, সত্যি কথাই তো, টাকার এত টানাটানি আপনার—আচ্ছা নিয়ে যান, জিনিসগুলো আমার নামে লিখিয়ে রাখব 'খন।

সানন্দে হার মেনে জিনিস নেয় তারা।

হল্‌এর এক প্রান্তে ভিজিটারদের জন্য দামী সোফা সেটি কৌচ পাতা। অন্তরঙ্গজনদের নিয়ে সেখানে দিব্বি আড্ডা জমে যায়। প্রায়ই চা আসে, সিগারেট আসে। ভাট্‌নগরের সেদিকে একটুও কার্পণ্য নেই। সপ্রগল্‌ভ আড্ডার মাঝেই স্বপ্না বোস এক এক সময়ে সকলকে সচেতন করে দেয়।—বেচারী ভাট্‌নগর ড্যাব-ড্যাব করে দেখছে দেখুন, আপনাদের ব্যাপার দেখে হার্টফেল না করে বসে।

জোড়া জোড়া চোখ ছোটে অদূরে মালিকের দিকে। দু'হাত তুলে ভাট্‌নগর একটা হতাশার ভাব দেখায়। কখনো বা স্বপ্না বোসের দিকে চেয়ে হাসে মৃদু-মৃদু। আবেশ জড়ানো হাসি। আর এদিক থেকে সে হাসির নীরব প্রত্যুত্তরও বোধ করি সবারই চোখে পড়ে। বুকের ভেতরটা খচ খচ করে ওঠে অনেকেরই। কিন্তু

ভাট্‌নগরের কাছ থেকে তাকে ছাড়িয়ে আনা সম্ভব নয় কোন মতে, এও এত দিনে সকলের কাছেই স্পষ্ট হয়ে গেছে। অবাঙ্গালী ভাট্‌নগরের ভাগ্য দেখে তারা ঈর্ষা করাও ছেড়ে দিয়েছে। এখন সেটা সরস হাস্য-কৌতুকের ব্যাপার।

স্বপ্না বোস শক্র-মুখে রসালাপের ছোট্ট বড়েটা এগিয়ে দেয় যেন।—চাকরিটা আমার আপনারাই খাবেন দেখছি।

হাঁ-হাঁ করে ওঠে তারা।—নিশ্চয় খাবো, আলবৎ খাবো, কবে খাবো বলুন—ভাট্‌নগর চাকরি খেতে দেরি করছে বলেই তো আমাদের অমন খাওয়াটা মাটি!

বলে বটে। কিন্তু ভাট্‌নগর সত্যিই যদি তার চাকরি খেয়ে এদের খাওয়াবার ব্যবস্থা করে, বিউটি হাউস দু'দিনেই তাহলে মরুভূমি হয়ে যাবে এও বোঝে। খাওয়া তাদের একদিন জুটবেই। তবে, ভাট্‌নগরের গৃহস্বামিনী হলেও শুধুই ঘরের বউ হয়ে থেকে স্বপ্না বোস ব্যবসা মাটি করবে না, এটুকুই ভরসা।

অবকাশ কালে ভাট্‌নগরও সহাস্য বদনে এদের হাল্‌কা ফূর্তিতে যোগ দেয়। বিভিন্ন পেশার লোক আছে স্তবক দলের গুঞ্জন-সভায়। ভাট্‌নগর ডাক্তারকে লক্ষ্য করে বলে, একবার স্টেথ্‌স-কোপটা লাগান দেখি বুকে, ঠিক চলছে কি না দেখি। কখনো বা নব্য ব্যারিস্টারের উদ্দেশ্যে বলে, আপনি রেডি থাকুন স্যর, ওর এগেইনস্‌টএ হয়ত শীগ্‌গিরই কেইস ঠুকতে হবে। ওর মানে স্বপ্না বোসের। কখনো বা অসহায় মুখে প্রোফেসার নামখ্যাত লোকটিরই স্মরণ নেয়। কিসের প্রোফেসার, কোথাকার প্রোফেসার জানে না (জানে না বোধ হয় কেউ-ই), তবু বলে, আপনার কাছে আমি দর্শন পড়ব প্রোফেসার—এ জীবনে আর কি সুখ!

হাসাহাসি পড়ে যায়। স্বপ্না বোসের পাশের জায়গাটা আপনিই খালি হয়ে যায়। জায়গাটা কে ছেড়ে দিলে ভালো করে খেয়াল না করেই ওর গা ঘেঁষে বসে পড়ে ভাট্‌নগর। স্বপ্না বোস তাকায় আড়চোখে। সে কটাক্ষ-বাণে ভাট্‌নগর কতটা বিদ্ধ হয় বলা শক্ত। কিন্তু আর যারা ব'সে, তাদের দৃষ্টি-পথে সে কটাক্ষ একেবারে মর্মে গিয়ে কাটা-ছেঁড়া করতে থাকে। হাসি-বিদ্যুত-প্রেম—এ তিনের একখানি ঝকঝকে ছুরি যেন। চোখের দু'কোণে একটু লালিমা, চোখের তারায় তড়িত-ঝলক, আর চোখের গভীরে কাজল-দীঘির নিবিড়তা। আঁখি-কোণের ওই লালিমা অবশ্য তারা যখন-তখন দেখে। দেখে পাগল হয়। কিন্তু এই তিনের ট্রায়ো সব সময়ে বড় চোখে পড়ে না।

আর, এই দৃষ্টি-মাধুর্য দর্শন থেকেই হয়ত সকলে এরা মনে মনে উপলব্ধি করেছিল, ভাট্‌নগরের কাছ থেকে স্বপ্না বোসকে ছাড়িয়ে আনার চেষ্টা স্বপ্নের মতই ব্যর্থ হবে। কারণ, মানুষটা তার এই বিচিত্র আত্মসমর্পণের ভেতর দিয়েই এই নারীর প্রসন্নতার শতকরা সবটুকুই দখল করে বসে আছে।

তবু কিন্তু চেষ্টার কসুর হয়নি।

চায়ের নেমন্তন্ন, সিনেমার আমন্ত্রণ, পিকনিক পার্টির আহ্বান—এমনি অনেক কিছুর সাদর এবং সাগ্রহ আকুতি সলজ্জ বিব্রত মুখে একের পর এক প্রত্যাখ্যান করেছে স্বপ্না বোস। খুব যে একটা জোরালো কারণ দেখাতে পেরেছে এমন নয়। পারেনি বলে বিব্রত হয়েছে, লজ্জিত হয়েছে আরো বেশি। নিরুপায় হয়ে রূপ-রসিকের দল যুগ্ম আহ্বান জানিয়েছে ওদের। ভাট্‌নগর খুশিতে ডগমগ। পারলে তক্ষুণি আমন্ত্রণ রক্ষা করতে ছোটে।

হাঁক-ডাক করে স্বপ্না বোসকে ডেকে সুসংবাদ শোনায়।

জবাবে আবার সেই কটাক্ষ-বাণ। ভ্রূকুটি করে স্বপ্না বোস শেষে এমন একটা কিছুর ওজর দেখায়, যাতে করে আমন্ত্রণকারী-দের সামনেই ভাট্‌নগরের সকল উৎসাহে যেন ঠাণ্ডা জল পড়ে এক প্রস্থ। বলে, অমুক দিন অমুক জায়গার অ্যাপয়েন্টমেণ্ট ভুলে বসে আছ এরই মধ্যে ?

বলে, মিস্টার আর মিসেস অ্যাডভানিকে কি কথা দিলে যে সেদিন ?

বলে, সেদিন আমাকে নিয়ে কোথায় যাবে বলে নাকে খত দিয়েছিলে ?

অথবা, কিছু না বলে একেবারে হতাশার দৃষ্টিতে শুধু চেয়েই থাকে, যার অর্থ,—এমন লোককে নিয়ে তো আর পারিনে !

ভাট্‌নগরের তাতেই পূর্ব কোন প্রতিশ্রুতি বা তেমনি কিছু একটা মনে পড়ে যায়। মাথা চুলকে বিব্রত মুখে মাপ চায় আমন্ত্রণকারীদের কাছে।

এই ক'বছরে সকলেই সখেদে উপলব্ধি করেছে, বিউটি হাউসের এই তিন ঘণ্টা ছাড়া স্বপ্না বোসের মনের আঙ্গিনায় আর পলকের ঠাঁই হবে না কারো। কিন্তু স্বপ্না বোস যাদু জানে। এই তিন ঘণ্টার সপ্রগল্‌ভ সান্নিধ্য-প্রাচুর্যের মোহও ভক্ত জনেরা কাটিয়ে উঠতে পারে না শেষ পর্যন্ত। পারতে চায়ও না। কিন্তু এর পরে কোথায় থাকে স্বপ্না বোস, কোন জগতে তার গতিবিধি, তার অবকাশ কালের কতটা দখল করে আছে ভাট্‌নগর—এসব প্রচ্ছন্ন জিজ্ঞাসার জবাব মেলেনি কিছু। মিলেছে এক টুকরো হাসি, এক লাইন কাব্য বা একটু কিছু হেঁয়ালী। শেষ পর্যন্ত ভাট্‌নগরের

ভাগ্যের ওপর ফোঁশ ফোঁশ নিঃশ্বাস ছেড়ে কৌতূহলে ক্ষান্ত দিয়েছে সকলেই।

বিউটি হাউসের আর এক বিপরীত আকর্ষণ ভূতনাথবাবু।

ভূতের যিনি নাথ তিনি আর যাই হোন, নিজে ভূত নন্। কিন্তু এ ভূতনাথের নামের সার্থকতা ষোলকলায় পূর্ণ। হল্এর একটা কোণের দিকে ছোট টেবিল পেতে বসে এক মনে একের পর এক ক্যাশমেমো কাটে। টাকা লেন-দেনের জন্য আলাদা ক্যাশ-কাউন্টার আছে। যে যাই কিনুক, সেল্স্ম্যান অথবা সেল্স্গার্লকে মাল নিয়ে আগে ওর টেবিলে ফেলতে হবে। এই তিন ঘণ্টায় মুখ তোলার অবকাশ থাকে না বেচারীর। তবু এরই মধ্যে ওকে নিয়ে প্রায়ই একটু-আধটু হাস্য-কৌতুকের প্রহসন ঘটে যায়।

মানুষটার চেহারার মধ্যে যেন বেপরোয়া কারুকার্য চালিয়ে গেছেন বিধাতা। গায়ের রঙ আবলুস কাঠকে হার মানায়। ছোট-ছোট চোখ দু'টোয় এতটুকু জীবনের সাড়া নেই।—একেবারে নিরাসক্ত, নিষ্প্রাণ। নাকটা হঠাৎ যেন সামনের দিকে তুবড়ে গেছে। পুরু ঠোঁট, প্রকাণ্ড মাথা, আর মাথাবোঝাই অবিন্যস্ত কোঁকড়ানো চুল। গায়ের রঙে চুলের রঙে মিশে গেছে। চোখ ধাঁধান বিউটি হাউসের ঝকমকানি একাই যেন ব্যালান্স করেছে ভূতনাথ। ভাট্নগরের রসজ্ঞানের তারিফ করে খদ্দের বন্ধুরা। সেলস্ম্যান, সেলস্গার্লরা একতরফাই হাসি-তামাসা করে ভূত-নাথের সঙ্গে। একতরফা কারণ, ভূতনাথ কোন কথার জবাব দেয় না, মুখ তুলে মড়া চোখে তাকায় একবার, মাথা নিচু করে মেমো কাটায় মন দেয় আবার।

ওর সঙ্গে স্বপ্না বোসের অন্তরঙ্গতাটুকু সব থেকে বেশি

উপভোগ্য। এ অন্তরঙ্গতাও একতরফাই। অর্থাৎ স্বপ্না বোসের তরফ থেকে। ভূতনাথকে নিয়ে কেউ কিছু বললেই সে প্রতিবাদ জানায় তৎক্ষণাৎ। বলে, রাহু ছাড়া চাঁদ মানায় না, ভূতনাথ ছাড়া বিউটি হাউস মানায় না। মেমো লেখাতে গিয়ে হাল্‌কা চাপল্যে তার মাথার ওই ঝাঁকড়া চুলের মুঠি ধরে দুই একবার ঝাঁকুনি দেওয়াটা প্রায় অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে ওর।

কোন রসিক ভক্ত ঠাট্টা করে।—এও যেন রাহুর সঙ্গে চাঁদের মিতালি।

মুচকি হেসে স্বপ্না বোস জবাব দেয়, একমাত্র রাহু ছাড়া চাঁদের কাছে আর ঠাঁই কার?

মাঝে মাঝে আরো বেশ খানিকটা গড়ায়। এখানকার সর্বজন-জ্ঞাত একটা বড় তামাসার কথা হল যে, ভূতনাথবাবু নাকি স্বপ্না বোসের প্রেমে পড়েছে। কার মাথায় যে প্রথম এই রসিকতাটুকু এসেছিল, সে আর কারো মনে নেই। কিন্তু কথাটা থেকে গেছে। কালোর সঙ্গে আলো মেশে না বলেই হয়ত এ ধরনের রসিকতা জমে ভালো। ভাট্‌নগরও সানন্দে যোগ দেয় এসব হাসি-ঠাট্টায়।

স্বপ্না বোস হয়ত বলে, মিথ্যে ওকে দোষ দেওয়া কেন, আমিই বরং ওর প্রেমে পড়ে গেছি।

শোনা মাত্র ভাট্‌নগরকে সচেতন করে দিতে চায় কেউ, বলে, সাবধান ভাট্‌নগরজী, ওই ভূত বাবাজীই কিন্তু শেষ পর্যন্ত একদিন আপনার ঘাড় থেকে—

মনোমত কথাটা আর হাতড়ে পায় না।

স্বপ্না বোস আল্‌তো করে জুড়ে দেয়, পেত্নী ছাড়াবে।

সমস্বরে হেসে ওঠে সকলে। ভাট্‌নগর একবার সস্নেহ দৃষ্টি

নিক্ষেপ করে দূরে কর্মরত মূর্তিটির দিকে। বলে, ভূতনাথ ইজ এ জ্যুয়েল—এ ব্ল্যাক জ্যুয়েল—রত্নের প্রতি আর লোভ না থাকে কোন্ মেয়ের!

তবু, মুখে যে যত হাসি তামাসাই করুক, একমাত্র ভাট্‌নগর ছাড়া স্বপ্না বোসকে যখন-তখন তরল হাস্যে ওই ভূতনাথের গায়ে-পিঠে হাত বুলোতে দেখে বা ঝাঁকড়া চুলের গোছায় বেপরোয়া চাঁপাকলি আঙুল চালাতে দেখে বুকের ভেতরটা চড়চড় করে ওঠে অনেকেরই।

* * * *

রাত ন'টা বেজে গেছে।

বিউটি হাউসের গেট বন্ধ। কর্মচারী কর্মচারিনীরা বিদায় নিয়েছে। কোমর-উঁচু ঝকঝকে কাঠঘেরা গণ্ডীর মধ্যে মালিকের নির্দিষ্ট গদি-আঁটা আসনে বসে গভীর মনোযোগে হিসেব দেখছে ভাট্‌নগর।

হল্‌এর অন্য প্রান্তে নিজের জায়গায় বসে সেদিনের বিক্রির মেমো ওলটাচ্ছে ভূতনাথ। মাঝে এক-আধবার চোখ যাচ্ছে তার বিপরীত কোণের দিকে, যেখানে ক্রেতা-অভ্যাগতদের জন্য সৌখীন সোফা-সেটি পাতা। কৌচের ওপর দেহ এলিয়ে দিয়েছে স্বপ্না বোস। শুধু এখন নয়, কাজের মধ্যেও আজ একাধিক বার নিবিষ্ট-চিত্ততায় ছেদ পড়েছে ভূতনাথবাবুর। ওই নারীমুখের হাস্যলাস্যের মাত্রাটা আজ বেড়েছিল, একটু একটু করে বেড়েই যাচ্ছে যেন। ছোট ছোট ঘরে নিরিবিলি সান্নিধ্যে আজ দু'বার দু'টো লোকের সঙ্গে গল্প করে কাটিয়েছে বেশ খানিকক্ষণ ধরে, তাও লক্ষ্য করেছে। মেমো লেখা ছেড়ে ভূতনাথ মুখ তোলে না বড়। কিন্তু চোখ এড়ায়

না কিছু, ভূতনাথবাবু সব দেখে।

কৌচের ওপর স্থাণুর মত পড়ে আছে স্বপ্না বোস। শ্রান্ত, ক্লান্ত। প্রায় নির্জীব যেন। ভালো লাগছে না। কিছুই ভালো লাগছে না। কান্নার মত একটা বিষাদের তরল স্রোত বইছে সর্বাঙ্গে। ভাবছে, কিছু ভাববে না। ভাবলেই তো ভাবনার বিভীষিকা বাড়ে। ভাবছেও না কিছু। তবু দুর্বোধ্য বোঝার মত কি যেন বুকে চেপে আছে।

অদ্ভুত নীরবতা বিউটি হাউসে। সবগুলো আলো জ্বলছে তেমনি। তেমনি ঝকঝক করছে শো-কেইসের দ্রব্যসম্ভার। কোথাও টুঁ-শব্দটি নেই। শুধু তিন কোণে তিনটি প্রাণী। সামনের দরজা বন্ধ। পিছনের পথ দিয়ে বেরোয় তারা। প্রাসাদ-সৌধের পিছন দিকেও একাধিক নির্গমনের ব্যবস্থা আছে। সেদিক দিয়ে বেরুলে বাড়ির মধ্যেই দশ দিকে দশ পথ।

ঠং করে ঘড়িতে শব্দ হল একটা। সাড়ে ন'টা বাজল। কৌচ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল স্বপ্না বোস। অলস মন্থর গতিতে পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো ভূতনাথ বাবুর কাছে।

মুখ না তুলেই ভূতনাথ বলল, বোসো।

হয়নি তোমার ?

হয়েছে। মেমো-বইয়ের ওপর পেপার-ওয়েট চাপা দিয়ে চোখে চোখ রাখল তার। তেমনি মড়া চোখ, ভাবলেশহীন, নির্বিকার। সে চোখে এতটুকু আগ্রহ নেই।

সামনের চেয়ারে বসে পড়ল স্বপ্না বোস। বিরক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, কি দেখছ ?

কিছু না,—খুব ক্লান্ত ?

নাঃ, ভালো লাগছে না কিছু।

লাগবে না তো।

কেন? কণ্ঠস্বরে তিক্ততা প্রকাশ পায় আবার।

ভূতনাথ শান্ত কণ্ঠে বলল, এখন শুধু ভালো লাগছে না, আর কিছু দিন বাদে তিলে তিলে জ্বলতে হবে। জেনে-শুনে নিজে দুঃখ সৃষ্টি করলে দুঃখের শেষ কোথায়?

থামো, থামো—। অস্ফুটকণ্ঠে প্রায় গর্জে ওঠে স্বপ্না বোস। চাপা কর্কশ স্বরে বলে ওঠে, খুব সাহস দেখি যে?

হ্যা-ল্-লো, ডোণ্ট ফাইট মাই ডিয়ার!

শশব্যস্তে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠল দু'জনেই। মেঝেতে পুরু কার্পেট পাতা, পায়ের শব্দ শোনা যায় না। ভাট্‌নগর কখন এসেছে দু'জনের কেউ খেয়াল করেনি।

সিট ডাউন, সিট ডাউন প্লীজ—।

বসল দু'জনেই।

এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে ভাট্‌নগর একটা শূন্য চেয়ারে এক পা তুলে দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ডাকল, স্বপ্না!

ইয়েস স্যার!

তোমাকে কিছু বলবার আছে।

ইয়েস্ স্যার…

ভাট্‌নগর তীক্ষ্ণ চোখে তাকে নিরীক্ষণ করল আবার একটু।— ইউ সিম্ টু ফরগেট ইওরসেলফ্…অপরকে ভোলানো আর নিজে ভোলা এক কথা নয়…ডোণ্ট রিসিভ ইন্‌ডিভিজুয়াল অ্যাটেনশান অ্যাণ্ড ইনভাইট ট্রাবলস্…আণ্ডারস্ট্যাণ্ড?

শুষ্ককণ্ঠে স্বপ্না বোস জবাব দিল, ইয়েস্ স্যার…।

গুড নাইট !

পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ভাট্‌নগর। আর হিংস্র শ্বাপদের মত জ্বলে উঠেছে স্বপ্না বোসের দুই চোখ। সে অদৃশ্য হবার পরেও সেই দিকে চেয়ে নিঃশব্দে আগুন ছড়ালো আরো খানিকক্ষণ।

পরে মাথা রাখল ভূতনাথের টেবিলের ওপরেই।

চেয়ার ছেড়ে ভূতনাথ উঠে দাঁড়াল। এক দিকের কাঁচের আলমারি খুলে একটা আরকের শিশি বার করল। ড্রপারে করে সাদা জলের মত আরক তুলে নিল কয়েক ফোঁটা। কাছে এসে বলল, ওঠো, রাত হয়েছে, এর পরে তো আরো কতক্ষণ লাগবে ঠিক নেই।

স্বপ্না বোস মাথা তুলল। কিছুটা সংযত, কিছুটা শান্ত। নিজেই দু'হাতের আঙুলে করে একটা চোখের ওপর নিচ টেনে ধরে আলোর দিকে মুখ ফেরালো। ভূতনাথ ড্রপ ফেলল চোখে। একে একে দুই চোখেই।

নীরবে উঠে গেল স্বপ্না বোস। এক কোণের আড়াল থেকে একটা পেটমোটা ভারী চামড়ার হাতব্যাগ তুলে নিয়ে পাশের দরজা দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

ভূতনাথ বসে আছে। নীরব, নিষ্পন্দ। যেন ঘুমিয়ে আছে। কোন তাড়া নেই। কোন চাঞ্চল্য নেই। সময় কেটে যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ বাদে ওই ব্যাগ হাতে নিয়েই আবার দেখা দিল যে নারী, তাকে চিনবে না বিউটি হাউসের অতি পরিচিত কোন খদ্দেরও।

ঘড়ির দিকে তাকালো ভূতনাথ। এক ঘণ্টা পার হয়ে গেছে।

হবারই কথা। রোজ ঘণ্টা তিনেক লাগে যে প্রসাধন সম্পূর্ণ হতে, সেটা তুলতে কম করে এক ঘণ্টা তো লাগবেই। এমনিতে ওঠে না। ওই হাতব্যাগে আছে নানা রকম রাসায়নিক নির্যাস। সেটা যথাস্থানে রেখে ভূতনাথের মুখোমুখি বসল আবার।

সদ্যঃস্নাতা। আটপৌরে বেশবাস। সর্বাঙ্গের চাঁপাহলুদ পেলবতা ধুয়ে-মুছে গেছে। শ্যামাঙ্গী। কুৎসিত। চোখের ভ্রূপে নেত্র-কোণের সেই মন-মাতানো লালিমার আভা কেটে গেছে। দাঁতের নিখুঁত প্লাস্টার-পালিশ উঠেছে। নিশ্চিহ্ন হয়েছে অধর-কোণের কামনা জাগানো তিলটাও।

অবসন্ন, বিষাদক্লিষ্ট তুই চোখ মেলে স্বপ্না বোস তাকালো ভূতনাথের দিকে।

ভূতনাথও তাকেই দেখছিল।

তার সেই মড়া চোখের দৃষ্টি যেন বদলে যাচ্ছে একটু একটু করে। নিস্পৃহতার আবরণটুকুও সরে যাচ্ছে। কোমলতার আভাস আসছে যেন। চেয়েই আছে ভূতনাথ।

ভারী সহজ লাগছে তার বিধাতার গড়া ওই নারীমূর্তি।

কুৎসিতের মধ্যেও কোথায় যেন সুন্দরের সন্ধান পেয়েছে সে।

ভুলভুলাইয়া

করিডোরে কতগুলো পায়ের শব্দ শুনে সান্ত্বনা সেন হিসেবের খাতা বন্ধ করে ফেলে দরজার দিকে তাকালো। 'প্রথম মহিলার দর্শন মাত্রে দু'চোখ বুজে হাত বাড়িয়ে দিয়ে নাটকীয় উচ্ছ্বাসে বলে উঠল, 'আমি সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়, আমি তারই লাগি পথ চেয়ে রই পথে যে জন ভাসায়।'

সমবেত হাসির শব্দে পুরুষ-কণ্ঠ কানে আসতে ভয়ানক অপ্রস্তুত হয়ে সান্ত্বনা চোখ মেলে তাকালো। চার আঙুল জিব কেটে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল তারপর। পুরুষ একজন নয়, তিন-জন। ইঞ্জিনিয়ার দত্তগুপ্ত, প্রফেসর রে, ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার নন্দী।

প্রিয় বান্ধবী মঞ্জুশ্রী দত্ত কল-কণ্ঠে বলে উঠল, আর বসে থাকতে হবে না, সর্বনাশের তেরস্পর্শ একেবারে ঘরের ভেতরে হাজির, এঁরা এবারে তোমাকে পথে ভাসাবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েই এসেছেন, অতএব তুমি স্যুটকেস আর হোল্ডঅল গুছিয়ে প্রস্তুত হও।

মঞ্জুশ্রী রেডিও আপিসে শুধু চাকরি করে না, প্লেও করে। অদূর ভবিষ্যতে চিত্র পরিবেশকের সুপারিশে কোনো ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে রাতারাতি যশস্বিনী হবার উষ্ণ আশা মনে মনে পোষণ করছে। (নন্দীর সঙ্গে এত অন্তরঙ্গতা শুধু এই জন্যে, নইলে আসল চোখ দু'টো তো তার দত্তগুপ্তকেই আঁকড়ে আছে)। সান্ত্বনার লজ্জাভিনয়টুকু নিখুঁত বলেই পীড়াদায়ক ঠেকল। জেনে-শুনেই অমনটা করল জানা কথা। কিন্তু ওতে প্রায় পুরুষেরই মুণ্ডু ঘুরবে সে-ও জানা কথাই।

স্মিত হাস্যে সান্ত্বনা আপ্যায়ন করল সকলকে, বসুন, বসুন—। ছদ্ম-কোপে মঞ্জুশ্রীকে চোখ রাঙালো, তুমি ভারী যাচ্ছেতাই তো! এমন সব গণ্যমান্য অতিথি নিয়ে আসছ, বাইরে থেকে একটা ওয়ার্নিং দিয়ে আসতে হয়, আমি কি করে জানব—

চোখ টাটালেও মঞ্জুশ্রী বান্ধবীর গুণানুরাগিণী। সাদা কথায় অনুগ্রহ প্রত্যাশিনী। জবাব দিল, ওয়ার্নিং দিয়ে এমন লজ্জারক্ত দৃশ্য থেকে গণ্যমান্য অতিথিদের বঞ্চিত করলে আমার নরকেও ঠাঁই হত না। ঠিক না মিঃ দত্তগুপ্ত?

দত্তগুপ্ত মাথা ঝাঁকালো।—ঠিক। কিন্তু এ সময়ে আপনাকে চড়াও করে বিরক্ত করলাম না তো? করছিলেন কি, হিসেব দেখছিলেন নিশ্চয়?

ছোট টেবিলে মার্কামারা মোটা লাল খাতাটার ওপর চোখ গেল সকলের। নন্দী বলল, 'রেস্ট হাউস' আপনাকে আর এক মুহূর্ত রেস্ট দিলে না। এবার বিদ্রোহ। আমাদের আরজিটা আপনিই পেশ করুন মঞ্জুশ্রী দেবী।

আরজির সাফল্যের প্রতি মঞ্জুশ্রীর বেশ আগ্রহ আছে দেখা গেল। বলল, পথে ভাসবার জন্য সান্ত্বনা পথ চেয়েই আছে এ আপনারা না ভুললেই হল। এর পরে আর কোনো অজুহাতে ছাড়ন-ছোড়ন নেই।

প্রোফেসার রে বাক নিঃসরণের সুযোগ পাচ্ছিল না। কলেজের মাস্টার, দত্তগুপ্ত এবং নন্দীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সান্ত্বনার কাছ ঘেঁষা তার কর্ম নয়। অত বড় আশাও রাখে না। চাকুরে মেয়ে মঞ্জুশ্রীকে পেলেই সে যথেষ্ট সান্ত্বনা পেতে পারে। এবারে উসখুস করে উঠল, রাইট! সেটা ভুললে কাব্যে উপেক্ষিতার মত হবে।

সঙ্গিদ্বয়ের ঠাণ্ডা চোখে চোখ পড়তে সে আবার চুপসে গেল। সান্ত্বনা এদের বক্তব্যটা সঠিক বুঝে উঠল না। বলল, কি ব্যাপার, ঘাবড়ে যাচ্ছি যে! আচ্ছা পরে শুনব, আগে একটু চা হোক।

দত্তগুপ্ত লাফিয়ে উঠল, শুধু চা হবে মানে? চায়ের সঙ্গে অনেক কিছু হবে। কিন্তু এখানে কিচ্ছু হবে না। নিজেদের অমন জায়গা থাকতে এখানে চা খেতে যাব কেন! তা' ছাড়া, উই ওয়াণ্ট ইয়োর আনকন্‌ডিশনাল সারেণ্ডার। চলুন রেস্ট হাউস-এ, সেখানে আমাদের আরজি নিয়ে আপনার সঙ্গে দস্তুরমত ফাইট চলবে।

সবার আগে মঞ্জুশ্রী সমর্থন-সূচক হাত তুলে ফেললে। সঙ্গে সঙ্গে বাকি সকলেরও হাত উঠল। এবং একে একে উঠেও দাঁড়াল সকলে। সান্ত্বনা মৃদু মৃদু হাসছে।—বেশ, রাজি আছি চলুন। কিন্তু এক সর্তে। আজ সবাই আপনারা অতিথি, রেস্ট হাউসের বিল্ পাবেন না।

মঞ্জুশ্রী এমন সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারাবে না। ধুপ করে আবার সে সোফায় বসে পড়ল।—আমি রাজি নই, তোমরা যাও তাহলে। বিজনেস্ ইজ বিজনেস্, সেটা তোমার বলে তুমি যা খুশি করতে পারো না। বিশেষ করে আমি যখন জানি কত বড় নিয়ম নিষ্ঠার ফলে রেস্ট হাউস আজ দাঁড়াবার মত দাঁড়িয়েছে। আজকের পার্স আমার—

চিত্র-পরিবেশক নন্দী উৎফুল্ল মুখে বলে উঠল, আমরাই কি দেব নাকি ওঁকে অমন অবিচার করতে, নিজেরা ব্যবসা করছি আর ব্যবসার মর্ম বুঝিনে? কিন্তু তা বলে আপনি কেন, এ নিয়ে দত্ত-গুপ্তর সঙ্গে আমার বরং হাতাহাতি হতে পারে।

দত্তগুপ্তও তেমনি সায় দিল, এক্‌জ্যাক্টলি সো, এবং আমার

লোহা-পেটা শরীর, তুমিও মানে মানে এখান থেকেই হার স্বীকার করে নাও। চলুন, আর দেরি নয়, আসল কথাটাই এখনো বাকি।

মঞ্জুশ্রীই হাসি মুখে অগ্রবর্তিনী হল এবার। রেস্ট হাউসের প্রতি এমনি অবিমিশ্র দরদে কর্ত্রীর মন কতটা ভিজল সেটা তার পক্ষে আঁচ করা শক্ত নয়। রেস্ট হাউসের অংশীদার, অন্যথায় ওয়ার্কিং পার্টনার হতে পারাটা বর্তমানের চরম লক্ষ্য। অনেক দিন ধরেই এই আমন্ত্রণের প্রত্যাশায় আছে।

দত্তগুপ্ত এবং নন্দীর মোটর দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে। সান্ত্বনার গাড়ি বার করবার দরকার নেই। নিজের ড্রাইভারকে যথাসময়ে হাজিরা দেবার নির্দেশ দিয়ে সে তাঁদের একজনের গাড়িতে গিয়ে বসল।

নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে হুজুরাণীকে সদলবলে আসতে দেখে কোট-প্যাণ্ট পরা ম্যানেজার থেকে তক্‌মাপরা বেয়ারা-খানসামা পর্যন্ত তটস্থ হয়ে পড়ল। রেস্ট হাউসের মাইনে বেশি কিন্তু চাকরি যেতে সময় লাগে না। এতটুকু ত্রুটি ঘটলে পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে পত্রপাঠ বিদেয় করে দেওয়াই রীতি।

দোতলার বড় ক্যাবিনে সকলকে বসতে বলে সান্ত্বনা সেন এক নজরে চতুর্দিক দেখে নিল। ছুটির দিনে এরই মধ্যে ভিড় মন্দ হয়নি। এ-কোণ ও-কোণ থেকে দু'চার জন মুখচেনা ধনীর দুলাল একটুখানি প্রসন্নতা বর্ষণের আশায় বার বার উৎসুক-নেত্রে তাকাতে লাগল। বঞ্চিত হল না। দূর থেকে পরিচয় সূচক কটাক্ষের উষ্ণ-পুলকে চায়ের স্বাদ বদলে গেল তাদের। নিচের ছোট ক্যাবিন-গুলোর বেশির ভাগই পরদা-টানা। ফাঁকে ফাঁকে যুগ্ম দয়িতের আভাষ মেলে। মৃদু হাসি, মৃদু গুঞ্জন, আর মৃদু মৃদু ঠুনঠান।

অদূরে একজন তরুণ লেখক বেপাড়ার সঙ্গী নিয়ে গল্পের প্লট সংগ্রহ করতে এসেছে। সঙ্গীর নির্বাক্ দৃষ্টি অনুধাবন করে মুচকি হেসে বলল, দেখো, কিন্তু চোখ দিও না।

চোখ আপনি যাচ্ছে, মহিলা কে ?

ট্যাণ্টেলাস কাপ। গলা জলে ডুবলেও জল-তেষ্টায় মারা যাবে।

কর্ত্রীর আগমনে কায়দা-দুরস্ত ম্যানেজার মোটা গদির চেয়ার ছেড়ে খদ্দেরের কাছে ঘুরে ঘুরে অমায়িক তদবির-তদারকে লেগে গেছে। বেয়ারারা এরই মধ্যে নিজ এলাকার খালি টেবিলগুলোও একাধিক বার ঝাড়ামোছা করে ফেললে। সান্ত্বনা নিজের চেম্বারে প্রবেশ করল। কোনো কাজে নয়, এমনি। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে ভেতরের দরজা দিয়ে ওপরে উঠে গেল।

দত্তগুপ্ত সকলের মতামত নিয়ে মেনু পাস্ করে দিয়েছে। উৎফুল্ল মুখে আহ্বান জানালো, আসুন—আমরা ভাবলুম আবার নিচে গিয়ে আপনাকে গ্রেপ্তার করে আনতে হবে।

সান্ত্বনা সেন বসল। প্রোফেসর রে এবং মঞ্জুশ্রীর মাঝের চেয়ারে। নন্দী বিরক্ত হল অধ্যাপকের ওপর, পাশের চেয়ারটিতে তার সরে যাওয়া উচিত ছিল। আর দত্তগুপ্ত ভাবল, মঞ্জুশ্রী ইচ্ছে করেই জায়গাটা ছেড়ে দিলে না। মাঝখান থেকে রে আড়ষ্ট হয়ে গেল একটু।

সান্ত্বনা বলল,—নিন, এবার আপনাদের বক্তব্য শোনান।

মঞ্জুশ্রী সুরু করল, বক্তব্যটা তোমার কানে নীরস লাগবে কিন্তু।

দত্তগুপ্ত বলল, শুধু একঘেয়ে কাজের অপকারিতা সম্বন্ধে আগে ছোটখাট একটা বক্তৃতা করে নিতে পারলে হত। ওহে রে, ওটা তোমার জুরিসডিকশান্, একবার দেখ না চেষ্টা করে, বাড়িতে তো

হোমিওপ্যাথি দু'চার ফোঁটা করো শুনেছি।

হাসতে চেষ্টা করে রে আরো বেশি হাসালো সকলকে। কিন্তু ইতিমধ্যে ক্যাবিনের পরদা নড়ে উঠল। বড় বড় দুটো ট্রে হাতে দু'জন বেয়ারা পরদা সরিয়ে ভেতরে ঢুকছে। সন্তর্পণে তারা টেবিলে খাবারের ডিস সাজিয়ে দিয়ে গেল। দত্তগুপ্ত জিভে একটা শব্দ করে সাড়ম্বরে বড় নিঃশ্বাস টেনে সবটা সুঘ্রাণ আস্বাদন করে ফেলল যেন।—আমাকে এখানেই একটা চাকরি দিন না সান্ত্বনা দেবী, সব ছেড়ে-ছুড়ে কাটলেট কামড়ে পড়ে থাকি।

হাসির শব্দে ঘর ভরে গেল।

সান্ত্বনা জবাব দিল, ওই বাইরে থেকেই, একবার ভেতরে এলে আর পালাতে পথ পাবেন না। অতঃপর আহার সংযোগে নানা ভণিতার মধ্য দিয়ে এদের আসল সঙ্কল্পটার মর্মোদ্ধার করল সে। কথা আর কিছুই নয়, দিন কতকের জন্যে সকলে মিলে প্লেজার ট্রিপে বেরুবে কোথাও। একঘেয়ে কাজের চাপে জীবন একেবারে দুঃসহ হয়ে উঠেছে নাকি।

দু'চোখ কপালে তুলে ফেললে সান্ত্বনা, কিন্তু আমি বেরোই কি করে!

দত্তগুপ্ত শক্ত হাতে হাল ধরলে, কেন আপনি কি একেবারে দাসখত লিখে দিয়েছেন রেস্ট হাউসের কাছে যে দু'দণ্ডও বিশ্রাম পাবেন না? আমার লোহালক্কড় পেটা শরীর তাতেই হাঁপ ধরে গেল, আর আপনার তো—

কথাটা আর শেষ হল না। নন্দী মুখের মাংসখণ্ড জঠরে চালান করে আবেদনের সূতো ধরল।—মোটা মোটা মাইনে দিয়ে ম্যানেজার, কর্মচারী সব রেখেছেন, দরকার হলে ক'টা দিন তারা

চালিয়ে নিতে পারবে না সেও তো ভাল কথা নয়। পারে কি না দেখার জন্যেই তো আপনার মাঝে মাঝে গা ঢাকা দেওয়া উচিত।

রে এবং মঞ্জুশ্রীর কান খাড়া থাকলেও হাত এবং মুখের অবকাশ নেই। তবু সুযোগের প্রতীক্ষায় আছে মঞ্জুশ্রী দত্ত। সমস্যা সমাধানে অগ্রবর্তিনী হল এবার। বলল, এ ভাবে সব ফেলে রেখে সান্ত্বনার পক্ষে যাওয়া অবশ্য শক্ত। বারো ভূতের কারবার, কে কি করে বসে থাকবে ঠিক নেই। সুনাম একবার গেলে তো সব গেল···কিন্তু এমন করে এঁরা যখন ধরেছেন তোমার যাওয়াই উচিত সান্ত্বনা। তা ছাড়া সত্যিই রেস্টও দরকার। আমি তো আছিই, যতটা পারি দেখাশুনা করব'খন দুবেলা—তুমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুরে এসো দিন কতক।

সে যে যাচ্ছে না দলের সঙ্গে এটা শুধু সান্ত্বনা নয়, অন্য সকলেও এই প্রথম শুনল এবং বিস্মিত হল। নন্দী জিজ্ঞাসা করে ফেলল, আপনি আছেন মানে ?

মঞ্জুশ্রী অল্প হেসে ভুরু কোঁচকালো।—বা রে, আমার চাকরি আছে না ? তা ছাড়া দু'জন গেলে চলে না শুনছেন তো ?

সান্ত্বনা প্রথমে যতই আকাশ থেকে পড়ুক, সদলবলে দিন-কতক কোথাও বেড়িয়ে আসার প্রলোভন একেবারে এড়াতে পারল না। রেস্ট হাউস ফেঁদে বসার পর থেকে কোথাও আর বেরুনো হয়ে ওঠেনি। মঞ্জুশ্রীর কথার জবাবে একটু ভেবে প্রায় স্বীকৃতির আভাস দিয়ে ফেলল।—তোমাকে এই ঘানিতে লাগিয়ে দিয়ে আমি বুঝি ফুর্তি করতে বেরুবো, গেলে সবাই একসঙ্গেই যাব, এখানকার কাজ এরাই চালিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু, কোথায় যাবেন আপনারা ?

দত্তগুপ্ত এবং নন্দী সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল। এমন কি রে-ও সানন্দে যোগ দিল তাতে। আর আসল উদ্দেশ্যই যখন ভেস্তে গেল, মঞ্জুশ্রী চাকরির দায়িত্বের প্রসঙ্গ পুনরুত্থাপন করাটাও সমীচীন বোধ করলে না। এবারে স্থান নির্বাচনের সমারোহ। নন্দী প্রস্তাব করলে, অজন্তা এলোরা পর্যন্ত টার্গেট করে নিয়ে চলুন বেরিয়ে পড়ি। শুনে রে'র মুখ শুকালো সবার আগে। তার ধারণা ছিল, প্লেজার ট্রিপ বলতে হাজারিবাগ রাঁচী নয় তো ভুবনেশ্বর পুরী। এবং এও ভেবে রেখেছে, কপাল ঠুকে জমানো টাকা নিঃশেষ করে মঞ্জুশ্রীর খরচার ভারও সবটা বহন করে দেখবে কপাল ফেরে কি না। কিন্তু এ যে তার নিজেরই যাওয়া দায় হয়ে উঠল! ও দিকে মঞ্জুশ্রীরও একই অবস্থা।

কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার দত্তগুপ্ত অজন্তা এলোরা এক কথায় নাকচ করে দিলে।—ওসব কাব্য আমার ভাল লাগবে না। তার থেকে চলো গোয়ালিয়র-ঝাঁসি—একেবারে ইতিহাসের খটখটে মরুভূমি। একটু কষ্ট করলে জয়পুরও সেরে আসা যায়।

ফুটন্ত তেলের কড়া আর জ্বলন্ত আগুন ছুই-ই সমান। রে এবং মঞ্জুশ্রী নিস্পৃহ মুখে পুডিং নাড়াচাড়া করতে লাগল। সান্ত্বনা মনে মনে প্ল্যান ছকে ফেলেছে।...বেরুবেই যখন, সেই লোকটার কালো মুখ আরো কালি করে দিয়ে আসা যাক না কেন? মনে হতেই একটা নারীসুলভ কৌতূহলও সুপরিস্ফুট হল মুখে। বলল, এরকম বেড়ানোর নাম বুঝি বিশ্রাম! ওতে আমি নেই, তার থেকে বরং লক্ষ্ণৌ চলুন, বেশ ভালো জায়গা।

বলা বাহুল্য, শেষ পর্যন্ত তাই সাব্যস্ত হল। আলোচনায় দেখা গেল, লক্ষ্ণৌ সত্যিই ভালো জায়গা, বেশ নিরিবিলি, পরিষ্কার-

পরিচ্ছন্ন, ভালো হোটেল আছে, ইত্যাদি। প্রফেসর রে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল, নিজের খরচাটা চালিয়ে সঙ্গী তো হতে পারবেই। মঞ্জুশ্রীরও খুব নাগালের বাইরে মনে হল না। শুধু যাতায়াত এবং হোটেল-খরচা। দেখা-শুনা বেড়ানো চা-রেস্তরাঁর আনুসঙ্গিক ব্যয়-ভার সঙ্গীরাই কাড়াকাড়ি ভাগ-বাটারা করে নেবে জানা কথা।

যে কালো মুখ কালি করে দেবার আগ্রহে সান্ত্বনা সেন হঠাৎ লক্ষ্ণৌ বেড়াতে যাওয়া স্থির করে ফেললে, সে দিকে এগোতে হলে কাহিনীর গোড়ার দিকে খানিকটা পিছিয়ে আসতে হবে। সেই কালো মুখ, অর্থাৎ, শিবদাস সেন ওর দিদির দূর সম্পর্কের দেওর হত। কিন্তু দাদার শালীর সঙ্গে দিদির দেওরের যে সহজাত রোমান্সের সম্ভাবনা ব্যাঙের ছাতার মত রাতারাতি গজিয়ে উঠতে পারে, তার ধার-পাশ দিয়েও এরা যায়নি। একই বাড়িতে অনেক দিন কাটিয়েছে, তবু না। তার দু'টো কারণ। প্রথমত, অমন চাষাড়ে গোঁয়ারগোবিন্দ মানুষের সঙ্গে রোমান্স হয় না। দূরসম্পর্কের দাদার আশ্রয়ে থেকে লোকটা যুদ্ধের আপিসে সামান্য কেরানীগিরি করে দেশে নিজের বিধবা মা-বোনের ভরণ-পোষণ নির্বাহ করত কোন রকমে। দ্বিতীয়, সান্ত্বনা সেনের টাকার ওজন না থাকুক, নিজের রূপের ওজনটুকু সম্বন্ধে সে ছেলেবেলা থেকেই দিব্বি সচেতন। সেটা ওর দোষ নয়, আর পাঁচজনে এমন করেছে। যখন ফ্রক পরত, পাড়া-প্রতিবেশী বলত, ফুটফুটে মেয়ে। ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পরে হেঁটে ইস্কুলে যাবার সময়ে রোজ ক'টা ছেলেকে টেনে আনছে মেয়ে-ইস্কুলের দোরগোড়া পর্যন্ত, সকৌতুকে সেটা খেয়াল করত। কলেজে ছাত্র এবং তরুণ প্রোফেসারদের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়েও কোন রকমে ঘষেমেজে আই-এ টা পাস করে ফেললে। কিন্তু

স্তাবক-পরিকীর্ণ হয়ে আর এগোনো গেল না। পর পর দু' বার বি, এ, ফেল করে পড়াশুনায় ইস্তফা দিলে।

মোটামুটি ঘরে-বরে বিয়ে করতে রাজি হলে তার আত্মীয়-পরিজন অনায়াসে সে ব্যবস্থা করতে পারতেন। কিন্তু সান্ত্বনা আমল দিলে না। কারণ, সে রকম যোগাযোগ থাকলে ওই রূপের জোয়ারে দু'চার জন আই, এ, এস আই, পি, এস অন্তত হাবুডুবু খেত, সেটা সে উপলব্ধি করতে পারে। যখন হল না, কাজ নেই বিয়েতে। চাকরির চেষ্টা করবে বলে দিদিকে চিঠি লিখে ছোট শহর কানা করে সে চলে এলো আজব শহর কলকাতায়। দিদি বললেন, ভালো করেছিস, এখনি হাঁড়ি ঠেলতে যাবি কেন, তার চেয়ে নিজের পায়ে দাঁড়া।

কিন্তু নিজের পায়ে দাঁড়ানও অত সহজ নয়। দরখাস্তর মধ্যে তো আর রূপের কথা লেখা যায় না। বি, এ ফেল মেয়ের দরখাস্ত বেশির ভাগই ওয়েস্ট পেপার বাস্‌কেট-এ সমাধি লাভ করছিল। শিবদাস সেন প্রস্তাব করল, কেরানীগিরি করতে রাজি থাকে তো তাদের আপিসে চেষ্টা করে দেখতে পারে। যুদ্ধের আপিসে কেরানীর মাইনেও খারাপ নয়।

অভিমানাহত দৃষ্টিবাণে সান্ত্বনা বিদ্ধ করতে চাইলে তাকে।—বেশ! এত দিন পরে বুঝি এই কথা! কোন্ সাম্রাজ্ঞীগিরিটা জুটছে যে কেরাণীগিরি করব না?

শিবদাস জবাব দিলে, আমাদের আপিসে সাম্রাজ্ঞীগিরিও করছেন কেউ কেউ, জায়গাটা খুব ভালো না বলেই এতদিন বলিনি।

সান্ত্বনার আগ্রহ চতুর্গুণ হল। ছদ্ম কোপে বলল, ঠাট্টা রাখুন, আমার বলে প্রাণান্ত অবস্থা—আপনি আজই চেষ্টা করুন।

ইণ্টারভিউর দু'দিনের মধ্যে সান্ত্বনার চাকরি হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্যের চাকাও ঘুরল। পাঁচমিশালি নবীন অফিসারদের সমাবেশ সেখানে। বছর না যেতে তাদের মোটরে যাতায়াত, বিলিতি রেস্তরাঁয় অবকাশ বিনোদন এবং সিনেমা দেখাটা বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেল। ইতিমধ্যে দিদির আশ্রয় ছেড়ে একটা বোর্ডিং-এ আলাদা ঘর নিয়েছে।

শিবদাসের গাত্রদাহ সকল সময় চাপা থাকে না। বলে, বেশ আছেন!

সান্ত্বনা হাসে। জবাব দেয়, আছি তো।

কিন্তু সত্যিই সান্ত্বনা বেশ নেই। অন্যের গাড়িতে চড়ে সুখ কতটুকু? তাতে করে চাকরিতে বড় জোর বছরে এক আধটা লিফট্ পেতে পারে। পেয়েছেও। কিন্তু তার বাসনার সাম্রাজ্যে ওটুকু উন্নতির কানাকড়িও দাম নেই।

যার যেমন ভাবনা, তার তেমন সিদ্ধি। সান্ত্বনার বিক্ষুব্ধ মস্তিষ্কে একদিন হঠাৎ যেন এক ঝলক আলোকপাত হয়ে গেল। ওপরওয়ালাদের সঙ্গে বড় রেস্তরাঁয় ঢুকে আগে শুধু সকৌতুকে লক্ষ্য করত, সেখানকার আবহাওয়া খানিকক্ষণের জন্যে বদলে যায়; প্রবেশ-পথে চার দিক থেকে সোজা বাঁকাচোরা কটাক্ষ ছাড়াও মনে হত ক্যাবিন থেকে তার নিষ্ক্রমণের প্রতীক্ষায়ও অনেকে বসে থাকে শুধু আর একবার চোখের দেখা দেখবে বলেই। এই থেকেই হঠাৎ একদিন ভিতরে একটা সঙ্কল্পের সূত্রপাত দেখা দিল।

তারপর দু'চার দিন সে একা এলো রেস্তরাঁয়। পরদা দেওয়া ক্যাবিনে প্রবেশ না করে সোজা গিয়ে বসল বাইরের খোলা টেবিলে। দু'এক পেয়ালা চায়ের অবকাশে অন্যমনস্কের মত সময়

কাটালো অনেকক্ষণ করে। আসল চোখ দু'টো তার ঠিকই সজাগ আছে। খদ্দের আসছে স্বাভাবিক হারেই, বেরুচ্ছে কম।....ওই কোণের টেবিলের চার জন চা দিয়ে সুরু করেছিল, এখন খাবারের অর্ডার দিচ্ছে। সামনের দু'তিনটে লোকের এক পেয়ালা চায়ে তৃষ্ণা মিটল না, আবার চা ফরমায়েস করল। দু'টো টেবিল পরের ওই অভিজাত তরুণ দলটি পরদা ঠেলে ক্যাবিনে ঢুকতে যাচ্ছিল, কিন্তু কেন যেন ক্যাবিন পছন্দ হল না তাদের, বাইরেই বসেছে। বয় এসে দাঁড়িয়েছে পাশে, কিন্তু কি খাবে সে জটলাই শেষ হচ্ছে না তাদের।

সান্ত্বনার ভাবনা ঘনীভূত হতে থাকল। এই প্রথম একজন যোগ্য সঙ্গীর অভাব অনুভব করল সে। শেষে আপিস ফেরতা শিবদাসকেই একদিন সঙ্গে করে রেস্তরাঁয় ঢুকল। লোকটা সরল হলেও নির্বোধ নয়, তার ওপর কাঠগোঁয়ার। কাজে লাগাতে পারলে ভালই কাজে লাগে। বাড়িতে ওকে অনেক বেগার খাটতে দেখেছে।

ভিড় ছিল। চায়ে চুমুক দিতে দিতে সান্ত্বনা এক সময় বলল, রেস্তরাঁগুলোয় কেমন বিক্রি দেখছেন···!

শিবদাস ঘাড় নাড়লে, বললে, কলকাতার ব্যাপার—।

কি ছাইয়ের চাকরি করেন, এরকম একটা খুলে বসুন না?

শিবদাস ভাবল কথার কথা। বলল, এটাই বাকি আছে।

কেন, পছন্দ হল না বুঝি?....অমন নিশ্চিন্ত কেরানীগিরি করছেন, পছন্দ হবেই বা কি করে!

শিবদাস বিরক্ত হল। বলল, তত্ত্বকথা রেখে চা'টা খেয়ে ফেলুন, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। এরকম একটা খুলে বসতে যে পুঁজি লাগে

সেটা থাকলে কেরানীগিরি করতাম না।

সান্ত্বনা কিছুক্ষণ চুপ-চাপ চেয়ে রইল তার মুখের দিকে, পরে এক নিঃশ্বাসে চায়ের পেয়ালা নিঃশেষ করে জবাব দিল, আপনার চোখ থাকলে তো পুঁজি চোখে পড়বে—।

বলা বাহুল্য, এবারে শিবদাস বিস্মিত হল। কিন্তু সান্ত্বনা ততক্ষণে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছে।

এর পরে হঠাৎ একটা পরিবর্তন দেখা গেল। বড় কর্তাদের মোটরগাড়ি অথবা সিনেমা রেস্তরাঁর আমন্ত্রণ যেন রাতারাতি জয় করে ফেলল সান্ত্বনা। ছুটি হবার সঙ্গে সঙ্গে শিবদাসকে টেনে তুলে তাঁদের নাকের ডগা দিয়ে আপিস থেকে বেরিয়ে আসে। কোনো দিন দিদির বাড়ি যায়, কোনো দিন নিজের বোর্ডিংএ নিয়ে আসে তাকে, কোনো দিন বা এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ায়। এ ব্যতিক্রম দেখে সকলেই বিস্মিত, শিবদাস নিজেও। অফিসাররা ভাবেন, এ আবার কোন কুগ্রহ এসে উদয় হল। সহকর্মীরা ভাবেন, অমাবস্যা-নিন্দিত মূর্তিটির বরাত বটে !

কিন্তু এ সৌভাগ্য বেশি দিন স্থায়ী হল না। ওপরওয়ালার বিষদৃষ্টিতে পড়ল শিবদাস। কাজে ত্রুটি ঘটলেই খিটির-মিটির বাঁধতে লাগল। আর ইদানীং ত্রুটি ঘটছেও কাজে। তার ওপর শিবদাসও রগচটা, ফস্ করে দু'এক কথা বলে বসত। ছুটির পরেও কাজ চাপানো হতে লাগল তার ওপর। কিন্তু সান্ত্বনা তাকে এক মিনিটও বেশি বসে থাকতে দেবে না। কাজ ধামাচাপা পড়ে থাকত পরের দিনের জন্য। গাড়িতে প্রতীক্ষারত ওপর-ওয়ালাকে দেখেও দেখে না সান্ত্বনা। শিবদাসের গা ঘেঁষে ডগমগিয়ে গল্প করতে করতে আপিস থেকে বেরিয়ে যায়।

যুদ্ধের আপিসের চাকরি। পেতেও সময় লাগত না, যেতেও না। একদিনের বাক্-বিতণ্ডা এবং সামান্য বচসার পরে শিবদাস একটা নোটিস্ পেল। স্তম্ভিত হয়ে দেখল, তার চাকরি গেছে। প্রথমেই সমস্ত রক্ত গিয়ে মাথায় উঠল। তার পরে দেশে বিধবা মা-বোনের কথা ভেবে অস্থির হয়ে পড়ল। সারা দিন বাড়ি বসে কাটিয়ে ছুটির সময় আস্তে আস্তে আপিসে এল। কিন্তু সসঙ্গিনী বড়কর্তার ঝকঝকে চাকাগুলো যেন তার হাড় পাঁজর গুঁড়িয়ে দিয়ে চলে গেল।

এর পরের ছুটির দিনে সান্ত্বনা নিজেই এলো তার সঙ্গে দেখা করতে। নিরিবিলিতেই পেল তাকে। অন্তরঙ্গ সুরে জিজ্ঞাসা করল, এখন কি করবেন?

শিবদাস জবাব দিলে না।

সান্ত্বনা আবার বলল, হাত পা ছেড়ে বসে থাকলে তো চলবে না, কিছু একটা করা দরকার।

শিবদাস জবাব দিল, ওপরে আপনার দিদি আছেন, সেখানে যান—নইলে কিছু একটা করে বসতেও পারি।

হুঁ, হুঁ—? সান্ত্বনা হেসে উঠল।

শিবদাসের গা জ্বলে যায়। বলল, ওরকম হাসি আপনার সাহেবের জন্যে তুলে রেখে দিন, কাজে লাগবে।···কিছু করবার আগে ওই লোকটাকে হাসপাতালে পাঠাব, সে খবরটাও তাকে দিয়ে দিতে পারেন।

দেব। সান্ত্বনার ছ'চোখ স্থির সংবদ্ধ থাকে তার মুখের ওপর। অনেকক্ষণ পরে বলল, তুমি একটি অপদার্থ, চাকরি খেয়েছে বেশ করেছে। পুরুষ মানুষ হয়ে কেরানীগিরির শোকে অমন মাথা

খারাপ করতে লজ্জা করে না ?

শিবদাস হঠাৎ থতমত খেয়ে গেল।

সান্ত্বনার কণ্ঠে স্থির আদেশের সুর ফুটে উঠল আবার।—যত দিন না তেমন রোজগার হচ্ছে, তোমার দেশের খরচা আমি চালাব। ব্যবসা করতে হবে। হাজার খানেক টাকা আমার জমেছে, আরো কিছু যোগাড়ের চেষ্টায় আছি। ছোট করে সুরু করাই ভালো—

শিবদাস হাঁ করে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ।—কি ব্যবসা, রেস্তরাঁ?

সান্ত্বনা মাথা নাড়লে, তাই—। তুমি ঠিকঠাক মত একখানা ঘর দেখে নাও।

তুমিও চাকরি ছাড়বে ?

বুদ্ধির বলিহারি! এক্ষুনি দু'জনেই চাকরি ছাড়লে চলবে কি করে? ব্যবসা দাঁড়াক, তোমার ওই চক্ষুশূল সাহেবের গালে চড় বসিয়ে চাকরি ছেড়ে আসব। কিন্তু অমন হাত পা ছেড়ে বসে থাক যদি, জীবনে আর মুখ দেখব না মনে থাকে যেন—

সান্ত্বনা সেন প্রস্থান করল। বিমূঢ় নেত্রে সেদিকে চেয়ে বসে রইল শিবদাস সেন। মানুষটা গোঁয়ার এবং সরল হলেও নির্বোধ নয়, আগেই বলা হয়েছে। কেমন যেন মনে হতে লাগল, তার চাকরি যাওয়ার ব্যাপারে প্রকারান্তরে এই দেবীটির হাত আছে।

কিন্তু তবু হাত-পা ছেড়ে আর বসে থাকল না শিবদাস। মুখ দেখাবার জন্যে না হোক, মুখ দেখবার তাগিদটুকু ভিতরে ভিতরে অনস্বীকার্য। যুগ্ম জল্পনা-কল্পনা চলল। চলল ঘর দেখা-দেখির পর্ব। শেষে ক্ষুদ্রাকৃতি 'রেস্ট হাউস'এর পত্তন ঘটল এক দিন। ছোট ঘর, স্বল্প আসবাবপত্র, স্বল্প বিধি-ব্যবস্থা। শুধু আশাটাই বড়।

শিবদাস অক্লান্ত পরিশ্রম করে। আপিস ফেরতা সান্ত্বনা সটান চলে আসে এখানে। কোনো দিন ছুটি নিয়ে আগেই আসে, কোনো দিন বা আপিস কামাই করে। ছুটির দিনে সারাক্ষণ থাকে। বসে বসে শ্যেনদৃষ্টিতে লক্ষ্য করে সব কিছু। কিন্তু ঠিক যেন আশাপ্রদ হচ্ছে না।

আপিস থেকে টাকা ধার করে যতটা সম্ভব সাজসরঞ্জাম বাড়ালো, পোষাক পরিচ্ছদ বদলে দিল 'বয়' দুটোর এবং খদ্দেরের তত্ত্বাবধানে অগ্রসর হল সে নিজেই।—আপন মনে বসে চা খাচ্ছে কলেজের তরুণ, তাকে গিয়ে বলল, শুধু চা খান কেন—ওতে লিভার ঠিক থাকে না, যখনি চা খাবেন আগে একটু কিছু মুখে দিয়ে নেবেন, আমার এখানে বলে বলছি না, সব জায়গাতেই। বয়! বাবু বিস্কুট-টিস্কুট কি নেবেন দেখো। কলেজের তরুণ খাবি খেতে খেতে বিস্কুট খেল। তারপর কাউকে বলল, পুডিং তার নিজের হাতের তৈরী, ব্যবসার ভেজাল নেই তাতে, কাউকে বা সহাস্যে জানালো তার চপ কাটলেটের স্যাম্পেল খাদ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠাবার বাসনা আছে।

রেস্ট হাউসের ভোল বদলাতে লাগল এবার। প্রথম ইস্কুল-কলেজের ছেলে ছোকরার ভিড়। গুজব শুনে অনেকের অভিভাবক-স্থানীয়রা এলেন পরিদর্শন করতে। সেই ছেলেদের আসা খানিকটা বন্ধ হল বটে কিন্তু এঁদের অনেকে আটকে গেলেন। মেয়ে পরি-চালিকার কথা শুনে শুভার্থিনী মেয়েরা আসতে লাগল দলে দলে। ফলে ছেলের সংখ্যা চতুর্গুণ বাড়লই।

ছোট ঘর বড় হ'ল। বড় ঘর আরো বড়। বিলিতি ফ্যাশান এবং বিধি-ব্যবস্থার ত্রুটি নেই। সান্ত্বনা চাকরি ছেড়েছে। শিবদাসের

চক্ষুশূল বড় কর্তার গালে চড় মেরে নয়, সেখানকার নানা পার্টিতে খানা সরবরাহের ব্যবস্থা করে।

কিন্তু রেস্তরাঁর অতিথিদের প্রতি তার এ সপ্রেমলভ অভ্যর্থনা শিবদাস ঠিক বরদাস্ত করে উঠতে পারত না। ফলাফল হাতে-নাতে দেখছে, তবু না। সান্ত্বনা সেটা মনে মনে উপলব্ধি করতে পারে, বিরক্ত হয়, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। এক নন্দীর কল্যাণেই তো কত সিনেমার পরিচালক থেকে অভিনেতা-অভিনেত্রীর আনাগোনা। জনাকীর্ণতা স্বজনের বীজাণু তারা, এ সত্যটা আর যেই ভুলুক সান্ত্বনা ভুলবে না। দত্তগুপ্তর মত ইঞ্জিনিয়ার, রে'র মত প্রোফেসারের আনাগোনা দরকার রেস্ট হাউসের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে। তাছাড়া দত্তগুপ্তর সঙ্গে যোগাযোগ আছে কতকগুলো খেলার প্রতিষ্ঠানের, রে'র সঙ্গে কাল্চারাল অ্যাসোসিয়েশানের।

অতিথিদের প্রতি সান্ত্বনার অন্তরঙ্গতা বাড়তে লাগল। বাড়তে লাগল শিবদাসকে সচেতন রাখবার জন্যেও। তাকে বিশ্বাস করে, ডান হাত বলে মনে করে এখনো। আগে অনেক দিন বিকেলে আপিস থেকে এসে দেখেছে তার তখনো পর্যন্ত খাওয়া হয়নি। সেই সততার ফল এখন পাচ্ছে, চাইলে আরো বেশি দিতে পারে সান্ত্বনা, আপত্তি নেই। কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। কোনো কটাক্ষ বরদাস্ত করবার পাত্রী নয়, আভাস মাত্রে সেটা সুস্পষ্ট বুঝিয়ে দেয়। তবু শিবদাস বলেই ফেলে, ভালো গোলকধাঁধা বানিয়েছে, একবার ঢুকলে আর বেরুবার পথ নেই।

সান্ত্বনা গম্ভীর মুখে জবাব দেয়, একটা চোখ আমার দিকে না রেখে দু'টো চোখই নিজের কাজে দাওগে যাও, নইলে

গোলক-ধাঁধা থেকে কেউ কেউ বেরিয়ে পড়তেও পারে।

পরক্ষণে হেসে ফেলে জবাবের তীব্রতা নরম করে নেয়। তা ছাড়া শিবদাস সঠিক বোঝেওনি। তার এ ঈর্ষা কোন্ প্রত্যাশায় সেটা অবশ্য সান্ত্বনা ভালই জানে, আর সে ঈর্ষা রেস্ট হাউসের নিরঙ্কুশ সফলতার প্রধান অন্তরায়। তাই সেটা অসহ্য আরো বেশি।

শিবদাসকে বিয়ে করার কথাটা কোনো দিনও মনে স্থান দেয়নি সান্ত্বনা। আজও না। যেটুকু অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য আগে ওকে দিয়েছে সে শুধু তাকে সক্রিয় এবং সচল রাখবার জন্য। এখন সে প্রয়োজন প্রায় ফুরিয়েছে। তা ছাড়া, আপাতত সে কাউকেই বিয়ে করতে রাজি নয়। সারা দেহে ভরা প্রাচুর্যের স্বাভাবিক তাড়নাটুকু অনুভব করেনি এমন নয়। কিন্তু তবু না। কারণ ঈর্ষা বস্তুটা শুধু শিবদাসেরই একচেটে নয়, সবারই এক অবস্থা হবে। বয়স বাড়ছে ? বাড়ুক....। আরো টাকা হোক, প্রচুর টাকা, অগুণতি টাকা। তার পর যাকে হোক ডেকে নিলেই হবে।

কিন্তু বিধির ব্যবস্থা অন্য রকম। অসন্তোষের স্ফুলিঙ্গটা ক্রমশ শিবদাসের মধ্যে ব্যাপ্ত হতে লাগল। সান্ত্বনার মধ্যেও। সেটা প্রকাশ পেল অন্য ভাবে। কর্মচারীদের প্রতি সান্ত্বনার ব্যবহার খুব দরদী নয়। সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলে চাকরি যায়। শিবদাস আসে ওদের হয়ে সুপারিশ করতে। ফল হয় না, উল্টে দুজনেরই বিক্ষোভ বাড়ে। এমনি একটা সামান্য উপলক্ষ নিয়েই মর্মান্তিক হেস্তনেস্ত হয়ে গেল একদিন।

রেস্ট হাউসের প্রথম আমলের 'বয়' দুটোর একজনের জবাব হয়ে গেছে। অবশ্য অপরাধ তার কম নয়। একদল অতি আধুনিক খদ্দেরকে বিশেষ সমাদরে অভ্যর্থনা এবং পরিবেশন করেও এক

পয়সা বখশিষ না পেয়ে বেফাঁশ কি যেন বলে ফেলেছিল।

কাজে জবাব হতে কান্নাকাটি জুড়ে দিল সে। তাতে যদি বা কাজ হত, সান্ত্বনা আরো বিগড়ে গেল শিবদাস সুপারিশ করতে আসায়। বলল, কোনো কথা শুনতে চাইনে, তুমি এবার থেকে ওদের আশকারা না দিলেই খুশি হব।

শিবদাসের রাগ চড়তে ওটুকুই যথেষ্ট। বসল তার মুখোমুখি। বলল, আর তুমিও কর্মচারীদের ওপর কথায় কথায় অমন দুর্ব্যবহার না করলে আমি খুশি হব।—প্রথম থেকে আছে লোকটা, এক কথায় তাকে যেতে বললেই হল ?

সান্ত্বনা কণ্ঠস্বর সংযত করল কোন প্রকারে। ধীরে-সুস্থে পরিষ্কার জবাব দিল, তেমন কারণ ঘটলে প্রথম থেকে আছে এমন ওর থেকে আরো অনেক বড় কর্মচারীকেও যেতে হতে পারে !

শিবদাস হতবাক্।···তার মানে ?

বুঝে নাও।

যা ঘটবার ওই সামান্য ক'টি কথাতেই ঘটে গেল। সমস্ত আশা আশ্বাস এক মুহূর্তে তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে গেল শিবদাসের। নিশ্চল মূর্তির মত বসে রইল অনেকক্ষণ। তার পরে একটি কথাও না বলে নিঃশব্দে উঠে চলে গেল।

সান্ত্বনা মনে মনে দুঃখিত হয়েছে। কিন্তু এ রকম একটা দিন আসবে সে জানত। আগে এসেছে, ভালই। ও চাইলে টাকা ছাড়া রেস্ট হাউসের কিছু অংশও তাকে লিখে দিত। কিন্তু মালিকানার সর্তে নয়, কর্ম-পরিচিতির সানুগ্রহ পুরস্কার হিসেবে। কিন্তু ওতে সে সন্তুষ্ট থাকবে না এও সান্ত্বনা জানতই।

দিদির বাড়ি থেকে খবর পেয়েছে লোকটা কলকাতা ছেড়ে

চলে গেছে উত্তর-প্রদেশে। সেখানেই একটা কাজ জুটিয়ে নিয়েছে হয়ত। নিজের বিবেকের কাছে পরিষ্কার থাকবার জন্যেই খুব পরিষ্কার করে শিবদাসকে একটা চিঠি লিখেছিল।—কোন্ সম্পর্ক নিয়ে পাশাপাশি তারা এখনো সংশ্লিষ্ট থাকতে পারে রেস্ট হাউসের সঙ্গে, সে সম্বন্ধে উচ্ছ্বাস-বিহীন বাস্তব সম্ভাবনা সমন্বিত পত্র।

সে চিঠি শিবদাস পেয়েছে। জবাব দেয়নি। তার চোখের আগুনে প্রতিটি ছত্র যেন পুড়িয়ে ঝলসে ফেলতে চেয়েছে। নির্মম ক্রূরতায় ওই নারী-দেহের হাড়-গোড় সুদ্ধু পিষে তালগোল করে ফেলতে পারলে জিঘাংশু মন শান্ত হত।

এবারে বর্তমানের কাহিনী নিয়ে অগ্রসর হওয়া চলে। দত্তগুপ্ত-নন্দী-রে'-অ্যাণ্ড কোম্পানীর সঙ্গে হঠাৎ বেড়াতে আসা সাব্যস্ত করে কৌতুক বশেই হয়ত সান্ত্বনা এত দিন বাদে আবার শিবদাসকে চিঠি লিখল।—'লক্ষ্ণৌ বেড়াতে আসছে, পুরানো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হবে।' কিন্তু সবটাই হয়ত কৌতুক নয়। ওকে ছাড়াও রেস্ট হাউস বিপুল গতিতে চলতে পারে এটা যদি সে বুঝে থাকে তাহলে এখনো তার ফিরে আসার পথ খোলা আছে, সে উদার আভাসও সান্ত্বনা সাক্ষাতে দেবে। মোটা মাইনে দিয়ে ম্যানেজার রেখেছে, তবু তার কাজের দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ এখনো সে ওকেই সকলের ওপরে প্রাধান্য দিতে রাজি আছে। নিজের উদারতা দেখে সান্ত্বনা নিজেই মনে মনে বিস্মিত হল, খুশি হল, তৃপ্ত হল। সে চিঠিও পেল শিবদাস এবং আগের মতই মনে মনে সমস্ত নখ-দন্ত দিয়ে যেন বিদীর্ণ করে ফেলতে চাইল তাকে।

লক্ষ্ণৌ সহরে দ্বিতীয় দিনে হোটেলে সান্ত্বনার সঙ্গে আবার দেখা হল শিবদাসের। তিন বছর পরে দেখা। শিবদাসই এসেছে।

সান্ত্বনা জানত আসবে। উৎফুল্ল মুখে অভ্যর্থনা করল, এসো এসো, আমি তো ভেবেছিলাম কালই আসবে। এলে না যে?

কাল আসেনি, আজই বা কেন এলো শিবদাস জানে না। এখানে সান্ত্বনা রেস্ট হাউসের কর্ত্রী নয়। হাস্যে-লাস্যে কৌতুকময়ী প্রিয় সখীটি যেন উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। ও মূর্তি শিবদাস চেনে।

সান্ত্বনার প্রথম সঙ্কল্প সফল হল। মানুষটার কালো মুখ আরো কালো হয়েছে। অপাঙ্গে ভালো করে লক্ষ্য করে নিল একটু, পরে তেমনি কলকণ্ঠেই বলল, বোসো—চেহারার তো দিব্বি উন্নতি হয়েছে দেখছি, ডন-বৈঠক করছ না কি! সঙ্গীদের দিকে তাকালো, মিঃ দত্তগুপ্ত, একে চিনলেন?

শুধু দত্তগুপ্ত নয়, বাকি সকলেও চিনেছে। সামান্য একজন পুরানো ম্যানেজারের প্রতি এতটা প্রীতি বর্ষণের তাৎপর্য কেউ বুঝল না। আহূত হয়ে দত্তগুপ্তও তেমনি পরিহাস-তরল কণ্ঠে বিস্ময় জ্ঞাপন করল।—আই সি! আপনার পুরানো ম্যানেজার তো—বাট্ ইউ, পি, রাইস্ সিমস্ টু স্যুট্ হিম সো নাইস্! হি লুকস্ এ পা-ফেক্ট ডেভিল নাও!

শিবদাসের চোখ দু'টো স্বল্পক্ষণ পড়ে থাকে তার মুখের ওপর। বলল, রেস্টুরেন্টএ ম্যানেজারি করলেও একটু-আধটু ইংরেজী বুঝি মশাই, ইউ, পি'র চালের কাছে বাংলার চাল ধাক্কা খেয়ে উল্টে পড়তে পারে।

ছন্দপতন ঘটল। সান্ত্বনার মুখেও শঙ্কার ছায়া নামল। এমন সামান্য লোকের মুখে এত বড় স্পর্ধার কথা শুনতে অভ্যস্ত নয় দত্তগুপ্ত। তড়াক করে দাঁড়িয়ে পড়ল চেয়ার ছেড়ে।

হোয়ট্!

চেয়ার ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল শিবদাসও। দত্তগুপ্ত নীরবে তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল একবার। পরে আবার চেয়ার নিল। বসল শিবদাসও।

নন্দী মনে মনে খুশি। লোহা-লক্কড়-পেটা শরীরের কথাটা মনে পড়ল বোধ হয়। মঞ্জুশ্রী এবং প্রফেসার রে' তখনো হতভম্ব। জের সামলাতে হল সান্ত্বনাকেই। অন্তত চেষ্টা করল সামলাতে। প্রথমে এক দফা হাসল খুব। অজস্র হাসি। পুরুষের চোখ বিভ্রান্ত করবার মত হাসি। পরে বলল, কাউকে রাগতে দেখলেই আমার হাসি পায়।—সত্যি বলছি মিঃ দত্তগুপ্ত, ও একেবারে রাগের ডিপো, কিন্তু তাহলেও লোক বেশ ভালো, বেশ নয়, খুব ভালো—তাই না ?

শেষের প্রশ্নটা শিবদাসের ওপরেই নিক্ষিপ্ত হতে আবহাওয়া ফিরল একটু। কিন্তু শিবদাস আবার উষ্ণ হয়ে উঠছে মনে মনে। খানিক বাদে শান্ত মুখে জিজ্ঞাসা করল, রেস্ট হাউস চলছে ভালো?

সান্ত্বনা নিরীহ মুখে জবাব দিল, কই আর চলছে, লোকসান খেয়ে খেয়ে তো হায়রান হয়ে গেলাম।

এবারে মঞ্জুশ্রী সশব্দে হেসে উঠল। শিবদাস আবার জিজ্ঞাসা করল, এখানে আছ কত দিন ?

তার তুমি সম্বোধনটা সকলের মনেই একটু-আধটু বিস্ময় উদ্রেক করল। সান্ত্বনা ছু'হাত উল্টে জবাব দিল, এঁরা জানেন।

আচ্ছা, আবার দেখা হবে। কারো দিকে না চেয়ে বা কোনো রকম অভিবাদন না জানিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু আবারও দেখা হল ঠিকই। পরদিনই। দলের সঙ্গে সঙ্গে এখানে-সেখানে ঘুরলও। কিন্তু কদাচিৎ কথা বলল। সেও সান্ত্বনা

গায়ে পড়ে এটা-সেটা জিজ্ঞাসা করতে। তাকে কলকাতা ফিরিয়ে নেবার সঙ্কল্প প্রথম দিনের সাক্ষাতেই প্রায় বাতিল করেছে, তাই অন্তরঙ্গতা প্রকাশে খুব কার্পণ্য করল না। কিন্তু এই খাপছাড়া লোকটা সঙ্গে থাকাতে দলের অর্ধেক আনন্দই মাটি। এমন কি অস্বস্তি লাগছিল সান্ত্বনারও। লোকটার চোখের ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে যেন কি আছে!

পরদিনও সকালের দিকেই এলো শিবদাস। সঙ্গিনী এবং সঙ্গীরা ইচ্ছে করেই কথা বলতে বলতে অন্য দিকে সরে গেল। সান্ত্বনা জানালো, মধ্যাহ্নে তারা যাচ্ছে 'ভুলভুলাইয়া' দেখতে। গোলকধাঁধা ভুলভুলাইয়া—হঠাৎ কি মনে পড়তে হেসে ফেলল। নিজের অজ্ঞাতেই জিজ্ঞাসা করল, তুমিও আসছ না কি?

যেতে পারি। কিন্তু তোমার ও গোলক-ধাঁধার কাছে এ আর এমন কি!

আমারটাই বা কি এমন? সান্ত্বনার কণ্ঠেও পরিহাসের সুর বাজল, তুমি তো দিব্বি সুট্ করে বেরিয়ে আসতে পারলে।

শিবদাস চেয়ে আছে। অনাদরের নির্মম আঘাতে সকল আশা সকল আনন্দ ধূলিসাৎ করে একদিন তাকে বিতাড়িত করে দিয়েছে যে নারী, তার এই মৌখিক আদরে সে আর বিচলিত হবে কতটুকু? দেখছে চেয়ে চেয়ে। দেখছে রেস্ট হাউসএর সেই স্বার্থচারিণী মালিককে। পিঞ্জরাবদ্ধ হিংস্র শ্বাপদ যেমন স্থির দৃষ্টিতে লেহন করে কাছের অথচ নাগালের বাইরের শিকারকে।

...দেখছে। দেখছে আর যেন ভাবছে কি। হঠাৎ গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ল সে। বলল, আচ্ছা সেখানে থাকব আমি।

দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। নিজের উপরেই বিরক্ত হল সান্ত্বনা।

কেন আবার আপ্যায়ন করতে গেল ছাই।

যথাসময়ে বড় ইমামবাড়ার ফটকে প্রবেশ করল তারা। ইতিহাসের স্মৃতিচিহ্ন। ওরই দোতলা থেকে পাঁচতলা পর্যন্ত সেই রোমাঞ্চকর ভুলভুলাইয়া।

ইমামবাড়ার সিঁড়ির কাছে আসতে সকলেরই চোখ গেল অদূরে ঘাসের ওপর শিবদাস শুয়ে আছে। তাদের দেখে ধীরে-সুস্থে উঠে এলো। একমাত্র সান্ত্বনা ছাড়া সকলেই বোধ হয় মনে মনে কটূক্তি করল। সান্ত্বনাও কোনো সম্ভাষণ জানালো না।

সিঁড়ি ধরে উঠে প্রথমে বিশাল হল্-ঘর। দু'চার জন গাইড এগিয়ে আসছিল। কিন্তু অন্য দিক থেকে একজন বৃদ্ধ গাইডকে ইশারায় ডাকল শিবদাস। বলল, এই লোকটাই সব থেকে বেশি এক্সপার্ট। গাইড আ-ভূমি কুর্নিশ করে সামনে এসে দাঁড়াল।

তাদের নিয়ে হল্-ঘরে প্রবেশ করে গাইড মুখ ছোটালো। ইতিহাস আর গল্পের চাটনি। এ ধরনের এত বড় হল্-ঘর নাকি পৃথিবীর আর কোথাও নেই। নবাব আসাফউদল্লার কীর্তি। বিরাট দুর্ভিক্ষ লেগেছিল দেশে। খেতে না পেয়ে মানুষ পিঁপড়ের মত মরছিল। কিন্তু মোল্লা যাকে দেয় না কিছু, তাকেও দেয় আসাফউদল্লা। নবাব হাজার হাজার লোক লাগালেন এই ইমারত গড়তে। বদলে তারা খেতে পাবে। কিন্তু এত লোকে এক-খানি ইমারত গড়তে ক'টি দিন আর লাগতে পারে! তার পর তো আবার সেই উপবাস। বিচিত্র ফন্দি আঁটলেন নবাব আসাফউদল্লা। দিনের বেলায় তারা যতটুকু গড়ে দিয়ে যায়, রাতের বেলায় নবাব-কর্মচারী সেটা ভেঙ্গে ফেলে। এই করে দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর ধরে অনিবার্য অনশনের হাত থেকে

প্রজাদের রক্ষা করলেন দয়ার অবতার নবাব আসাফউদল্লা। দুর্ভিক্ষ দূর হতে তাদের নির্মাণ-কাজ শেষ হল।

চোস্ত উর্দুতে ইতিহাসের গল্প শুনে মশগুল হয়ে গেল সবাই। সব-কিছুর পিছনেই গাইড গল্প ফাঁদতে লাগল। সিংহাসন, সোনা-মোড়া আয়না, মোমের তাজিয়া, হাজার-পাতি ঝাড়—। তারা শুনছে, দেখছে। হঠাৎ মঞ্জুশ্রী বলল, ও মা! বেলা গড়িয়ে আসছে, ভুলভুলাইয়াতে উঠব কখন? পাঁচটার পরে তো আর উঠতে দেবে না।

দেখা গেল গাইড বাংলা বোঝে। জানালো, সেটা নিয়ম বটে, তবে নিয়মের কড়াকড়ি হুজুর আর হুজুরাণী বিশেষে নির্ভর করে। তা'ছাড়া পাঁচটার দেরিও আছে, ঠিক দেখা হবে।

অন্ধকার হয়ে যাবে না?

গাইড সেটা আর অস্বীকার করলে না। পায়ে পায়ে অগ্রসর হল সকলে। নন্দী জিজ্ঞাসা করল, ভুলভুলাইয়া কী?

ভুলভুলাইয়া? গাইড সাগ্রহে ঘুরে দাঁড়াল এবং গম্ভীর মুখে গল্প সুরু করল আবার।—ভুলভুলাইয়া হল বিচিত্র রকমের এক গোলকধাঁধা। দোতলা থেকে বিপুল প্রাসাদ-সৌধের ওই পাঁচ-তলা পর্যন্ত। বেগমদের সঙ্গে কোনো সুরসিক নবাব লুকোচুরি খেলত সেখানে। পরের নবাবেরা অবিশ্বাসিনী বেগমদের এখানে এনে ছেড়ে দিত। উপবাসে অনিদ্রায় দিনের পর দিন তারা আর্ত হাহাকারে নিষ্ক্রমণের পথ খুঁজে বেড়াতো। পাগল হয়ে শেষকালে মাথা ঠুকে আত্মহত্যা করত তারা। ভুলভুলাইয়ার একটি মাত্র প্রবেশ-পথ এবং বেরুবার পথও ওই একটিই। কিন্তু একবার ঢুকলে খুঁজে আর সে পথ বার করা যায় না।

গল্প শুনে মঞ্জুশ্রীর গা ছমছম করে উঠলো। বলল, আমার ভয় করছে, শেষে যদি না বেরুতে পারি। সান্ত্বনারও কপাল ঠুকে আত্মহত্যার কাহিনী শুনে কেমন লাগছিল। তবু ঠাট্টা করল, না বেরুতে পারলে এঁদের মধ্যেও কেউ থেকে যাবেন, সুখে ঘরকর্না কোরো। বক্র কটাক্ষপাতটা অধ্যাপকের উদ্দেশে।

কিন্তু একেবারে উড়িয়ে দিল দত্তগুপ্ত। বলল, হুঁঃ, যত সব আজগুবি গল্প। বেরুতে দেরি হতে পারে, তা'বলে একেবারে বেরুনো যাবে না কি!

আভূমি নত হয়ে আবার কুর্নিশ করলে গাইড। বলল, বান্দার গোস্তাকি মাফ হয়, বেরুতে পারলে পাঁচ তলার ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ে গর্দান দেবে সে, কিন্তু না পারলে হুজুর যেন খুশি হয়ে একখানা এক শ' টাকার নোট্ নেক্‌নজর করেন।

এ রকম একটা বাজি ধরা কোনো কাজের কথা নয়। কিন্তু শুনে সকলেরই কৌতূহল উদ্দীপিত হল আরো।

গাইডের পিছন পিছন ভুলভুলাইয়ার সিঁড়ি ধরে দোতলায় উঠল সকলে। গাইড বলল, এই এক সিঁড়ি মিললে তবে নেবে আসা যাবে, কিন্তু দেখা যাক্ মেলে কি না। এঁকেবেঁকে নানা পথ ধরে সৌধের অভ্যন্তরে প্রবেশ করল সকলকে নিয়ে। ছোট বড় অগুণতি সিঁড়ি এবং অজস্র সরু সরু পথের অভিযান। কোথা থেকে কোথায় গিয়ে পড়েছে সব ঘুলিয়ে গেল। দোতলা থেকে তিন তলায় উঠেছে কখন তাও ঠাওর পেল না। অজস্র পথের জটিল সমারোহ আর অজস্র ওঠা-নামা। সঙ্গে সঙ্গে সুরু হল গাইডের লুকোচুরি খেলা। হঠাৎ একটা দেয়ালের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে ডাকলে, আইয়ে। আবছা অন্ধকারে সকলে অনুসরণ করল। ও মা! কোথায়

আইয়ে! এ-ধার থেকে ডাকছে, আইয়ে! ও-ধার থেকে ডাকছে, আইয়ে! ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে—কিন্তু তার টিকিটি নেই। এ দিকে দলের মধ্যে হাসাহাসি ছুটাছুটি পড়ে গেল। নিজেদের অজ্ঞাতেই ক্রমশ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ছে তারা। আশে-পাশে দূরে কণ্ঠস্বর শুনে ঘুরছে সরু সরু কানা গলির মধ্যে। এ-ধার থেকে ও-ধার থেকে তাদের হাসির শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে পাষাণপুরীতে। চকিতে কাউকে দেখা দেয় গাইড, ডাকে আইয়ে, পরক্ষণেই কোন্ পথ দিয়ে কোথায় মিলিয়ে যায়, হদিস পায় না।

অন্ধকার হয়ে আসছে আরো। ফস্-ফস্ করে দেশলাই জ্বালা হচ্ছে বার বার। দত্তগুপ্তর হাঁপ ধরে গেল। এক দিক থেকে তার হাঁক শোনা গেল, গাইড! পরক্ষণে অবিকল তার কণ্ঠস্বর নকল করে দূর থেকে গাইড জবাব দিল, আইয়ে! আবার জমে উঠল। এ দিক থেকে নন্দী ডাকে, ও দিক থেকে মঞ্জুশ্রী, আর এক দিক থেকে রে। সকলেরই কণ্ঠস্বর নকল করে প্রত্যুত্তর দেয় গাইড। একটু বাদে বেশ দূর থেকে সান্ত্বনার কণ্ঠস্বর শোনা গেল যেন। দত্তগুপ্ত আর মঞ্জুশ্রী তখন একত্র হয়েছে। মঞ্জুশ্রী হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, কি সাজ্ঘাতিক লোকটা—ঠিক সান্ত্বনার গলা নকল করছে!

কিন্তু সে কণ্ঠস্বর নকল নয়। তাদের মধ্যেই কারো পদধ্বনি অনুসরণ করে সান্ত্বনাও ছিটকে পড়েছিল কোথা থেকে কোথায়। পথ হারিয়ে ফেলে পথ খোঁজার নেশায় সে-ও মেতেছিল। সত্যিই তো আর ভয়ের কিছু নেই। কত দূরে এসেছে, এত বার ওঠা-নামা করে কোন্ তলায় আছে কিছুই ঠাওর করতে পারছিল না, মজা লাগছিল বেশ।…একটা গাঢ় অন্ধকার পরিবেশের মধ্যে পড়ে থমকে দাঁড়াল। পরক্ষণে মনুষ্যস্পর্শে থরথর করে কেঁপে উঠল

সে! সহসা কার দু'টো কঠিন বাহুর নির্মম নিষ্পেষণে দেহের হাড়গোড়-সুদ্ধ যেন গুঁড়িয়ে যেতে লাগল তার। অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল একবার। দ্বিতীয় বারের চেষ্টা এক হিংস্র অধরগহ্বরেই বিলীন হল।....দ্রুত...দ্রুত...দ্রুত হারিয়ে ফেলছে সান্ত্বনা নিজেকে। হাল ছেড়ে দিল। হারিয়ে গেল।....অব্যক্ত যন্ত্রণা।...অব্যক্ত বিস্মৃতি!...নিশ্চেতন...কল্পান্ত!

গাইডের উদ্দেশে দত্তগুপ্তর উত্তেজিত বকাবকি শুনে যেন এক যুগ বাদে চেতনা ফিরল সান্ত্বনার। অনেকগুলি পদধ্বনি। উর্দুভাষী গাইডের বিনম্র আকৃতি,—এক্ষুনি তল্লাস মিলে যাবে হুজুর, ঘাবড়িও না। দেওয়াল ধরে ধরে সান্ত্বনা উঠে দাঁড়াল। দেহের সব বাঁধুনি যেন পৃথক হয়ে গেছে। প্রাণপণে নিজেকে সংযত করল, সংবৃত করল। পারছে না, তবুও।

তাকে আবিষ্কার করে সকলে কলকণ্ঠে চেঁচামেচি করে উঠল। দেশলাইয়ের ক্ষণিক আলোতেও নিঃসাড় পাণ্ডুর মূর্তিটি চোখে পড়ল সকলের। ভাবল, ভয় পেয়েছে খুব। মঞ্জুশ্রী বলল, আধ ঘণ্টা ধরে ডাকাডাকি করছি, একটা সাড়া দিলে না পর্যন্ত, ফিট হয়ে গেছলে না কি! হাত ধরল।

দত্তগুপ্ত এবং নন্দী গাইডকে ধরে সেখানেই মারে আর কি।

শ্রান্তক্লান্ত হয়ে গোলকধাঁধা থেকে বেরুবার তাড়ায় আর একজনের কথা অন্তত এদের কারো মনে নেই। শিবদাস। বাইরে এসে দেখা গেল আবছা অন্ধকারে সে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

সান্ত্বনা কোনো দিকে দৃকপাত না করে সোজা গাড়িতে উঠল। ....হোটেল। তারপর কলকাতা!

সান্ত্বনার পরিবর্তন দেখে সঙ্গী-সাথীরা অকূল পাথারে পড়ল।

বিস্মিত হল, উদ্বিগ্ন হল, বেদনাহত হল তার অস্বাভাবিক ব্যবহারে। দিন যায়, মাস যায় একটা, দুটো। কিন্তু মুখে সেই দুরূহ গাম্ভীর্যের বর্ম আঁটা। রেস্ট হাউসে আসে, নিজের চেম্বারে বসে'থাকে চুপ করে, অতিথি অভ্যর্থনায় হাসিমুখে এগিয়ে আসে না আর, কর্মচারী-দের সঙ্গেও কথা বলে না বড় একটা। মাঝে মাঝে কামাইও করে। বেগতিক দেখে দত্তগুপ্ত বিয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করেছিল। নন্দীও। কিন্তু ওর ভ্রূকুটিতে মুখ চুন করে ফিরে গেছে।

শেষে একদিন মঞ্জুশ্রীকে নিজে থেকেই ডেকে এনে রেস্ট হাউসের কিছুটা অংশ লেখাপড়া করে দিল। দেখাশুনার সকল ভার অর্পণ করল তার ওপর। এতদিনের আশা!....বিগলিত হয়ে মঞ্জুশ্রী জিজ্ঞাসা করল, তোমার কি হয়েছে আমাকে খুলে বলবে না?

সান্ত্বনা ক্ষুদ্র জবাব দিল, কিছু না।

হয়েছে যা, তার স্থূল দিকটার জন্যে সান্ত্বনার এমন অস্বাভাবিক পরিবর্তন নয়। টাকা আছে। টাকা থাকলে ব্যবস্থাও আছে। বিজ্ঞানের যুগ। ব্যবস্থা এক রকম করেই রেখেছে। ইতিমধ্যেই নিশ্চিন্ত হতে পারত। কিন্তু থাক না, তাড়া কি!....অন্য পরিবর্তনটাই বিষম। ওই সম্ভাবনাটুকু একেবারে নির্মূল করে ফেলতে মন চাইছে না, এ সত্য নিজের কাছেও যে গোপন থাকছে না আর! তা' ছাড়া, ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়ে কল্পনায় যে মানুষ-দানবকে ফাঁসিতে লটকেছে দিনে ক'বার করে আর নির্মম আনন্দ উপভোগ করেছে তার তাজা দেহের ছটফটানি দেখে, তারই সেই পশু-শক্তিটা আজও যেন আষ্টেপৃষ্ঠে আঁকড়ে আছে অক্টোপাসের মত। সেই অব্যক্ত যাতনা, আর অব্যক্ত বিস্মৃতি···।

সব শেষে নিজের ওপরেই আগুন হয়ে উঠল সান্ত্বনা। দেরি

হয়ে যাচ্ছে। আর দেরি নয়। আর দুর্বলতাও নয়। টেলিফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করল ডাক্তারের সঙ্গে।···টাকা নিল। মোটা টাকা লাগবে। মোটা টাকাই নিল। কিন্তু মোটরে বসে সমস্ত দেহমন যেন শিথিল হয়ে আসছে আবার। মনে হল, একটা নির্মম হত্যা অনুষ্ঠিত করতে চলেছে সে। হত্যা?···হত্যা বই কি!··তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ড্রাইভারকে যে দিকে যেতে আদেশ দিল সান্ত্বনা, সেটা হাওড়া স্টেশনের পথ।

····কিন্তু দিন কতকের মধ্যেই ফিরল আবার। ফিরল একা। ফিরল ভুলভুলাইয়ার দেশ থেকে। বাসস্থান বদলে ফেলল সকলের অজ্ঞাতে। রেস্ট হাউস চলে। মঞ্জুশ্রী চালায়। নতুন আবর্তের সৃষ্টি হয় তাকে ঘিরে। সান্ত্বনা খবর রাখে না। সারাক্ষণ দরজা বন্ধ তার ঘরের। সান্ত্বনা পথ হারিয়েছে। ভুলভুলাইয়ার একটি মাত্র পথ। সে পথের খোঁজ দেবে যে, সে নিখোঁজ।

শিকার

অন্ধকারে বিহারীলালের চোখও বিড়ালের মতই জ্বলে। যারা দেখেছে তারা বলে। যারা দেখেনি তারাও বলে। সামনে বা আড়ালে বিহারীলালকে নিয়ে কম বলাবলি হয় না।

বড়বাবুর পরেই পদমর্যাদা। বড়বাবু অর্থাৎ থানার ও, সি বা ইনস্‌পেক্টর। বিহারীলাল সব্‌-ইনস্‌পেক্টর। ছিল কি? প্রথমে লিটারারি কন্‌স্টেব্‌ল, তাপর অ্যাসিস্‌ট্যান্ট সব্‌-ইনস্‌পেক্টর, আর তারপরে দেখতে দেখতে এই। আরো ত্ব'জন সব্‌-ইনস্‌পেক্টর আছেন থানায়। তাঁরা বয়সে প্রবীণ এবং চাকুরিতে সিনিয়র হলেও মনে মনে শঙ্কিত। যে রেট্‌-এ টপকে আসছে, খুব নিশ্চিন্ত থাকার কারণ নেই।

বড়বাবুর মাথার তিনভাগ চুল শাদা। তাঁর তেমন ভয় নেই। তবু হাল্‌কা টিপ্পনী কাটেন মাঝে মাঝে, মুখখানা দেখো একবার, যেন ত্বনিয়াসুদ্ধ লোক অপরাধী—এই এলাকার সবগুলো লোককে থানায় এনে পুরতে পারলে বোধ হয় বিহারীলালের সব থেকে বেশি আনন্দ, কি বলো?

বিহারীলাল বলে না কিছু। হাসে একটু, বা চেষ্টা করে হাসতে। তারপর দিনগত রিপোর্ট লিখতে বসে যায়।

প্রৌঢ় সহকর্মী ত্ব'জনও ঠাট্টার ছলে নিজেদের জ্বালা জুড়োন একটু। একে অন্যকে লক্ষ্য করে বলেন, গোঁড়া হিন্দু জাত খোয়ালে কি হয়? পরে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন, ওই—! অর্থাৎ বিহারী-লাল হয়। অর্থাৎ অমনি মায়া-দয়াশূন্য হয়।

আরো মন দিয়ে রিপোর্ট লেখে বিহারীলাল। আর, আড়ালে

যা বলেন তাঁরা, স্বকর্ণে না শুনুক, কানে আসে। বলেন, এই করেই কয়লার কালি উঠবে ভেবেছে, নিজে কোন্ আস্তাকুড়ে ছিলি মনে নেই।

সব ক'টা শ্লেষের পিছনেই একটু ইতিহাস আছে।

বিহারীলাল বাঙালী নয়। কিন্তু এই তিরিশ বছরের মধ্যে বাংলার বাইরে কখনো পা ফেলেছে বলেও মনে পড়ে না। কোথা থেকে কেমন করে একদিন শহরের সেই নারকীয় আশ্রয়ে ভেসে এসেছিল জানে না। কেমন করেই বা সেই নিদারুণ অভাব অনটন অনাচারের মধ্যে পাঁচ থেকে বিশ বছর বয়স পর্যন্ত নির্বিকারে একটানা কাটিয়ে দিল, সেও এক বিস্ময়। আশ্রয়চ্যুত হয়েছিল যখন বি, এ পড়ে। ইস্কুলে থাকতেই ছেলে পড়িয়ে পড়া চালাত। নিজের মাইনে লাগত না। যা পেত প্রতিষ্ঠান কর্তাদের হাতে তুলে দিত। নইলে তারা পড়তেই বা দেবে কেন, খেতেই বা দেবে কেন? কঠোর বিধিব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে সেখানে পড়াশুনা শুরু করতে হত সকল শিশুকেই। কিন্তু সে অধ্যায় আবার শেষও হত দু'চার বছরের মধ্যেই। বিহারীলালের বেলায় ব্যতিক্রম ঘটেছিল। কেন, নিজেও জানে না। চেষ্টা? অধ্যবসায়? কিছু না, কিচ্ছু না। যে কোনদিন শেষ হতে পারত। হয়নি এই পর্যন্ত…।

সেই আশ্রয়ের স্মৃতি কিছু মনে নেই বিহারীলালের? আছে বই কি। তার অনেক সতীর্থ আজ ওরই কর্ম-তৎপরতায় জেল খাটছে। প্রতিষ্ঠান-কর্তাদেরও দুই একজনকে টেনে এনেছে। অসহায় বিস্ময়ে তারা একদা তাদেরই আশ্রিত এই পাথর মূর্তিটি দেখেছে চেয়ে চেয়ে।

সুখস্মৃতি কিছু ? না। ওখানে সুখও ছিল না কিছু, দুঃখও না। সুখদুঃখ বোধের বালাই নিয়ে ও জায়গায় কারো টেকা সম্ভব নয়। তবু এরই মধ্যে এক বুড়ীকে ধোঁয়া ধোঁয়া মনে পড়ে বিহারী-লালের। ইস্কুলের উঁচু ক্লাসেই পড়ত তখন। খুব অসুখ হয়েছিল। বেদম জ্বর। ওই বুড়ী আসত। জলবাতাস করত। ওর মাথাটা কোলে নিয়ে বসত। একদিন তার কোলে মুখ গুঁজে কেঁদেওছিল বিহারীলাল, মনে আছে। থাকবেই বা না কেন, কান্নাকাটি আবার কবে করেছে তারা ? সেই বুড়ীও তারই মত আশ্রিত। কিন্তু ভালো হয়ে আর খুব বেশিদিন দেখেনি তাকে।

বিহারীলালের আশ্রয়চ্যুতির কারণ এমন কিছু নয়। ইচ্ছেমত প্রতিষ্ঠানের হিসেবপত্র মিলানো চলছিল তাকে দিয়ে। সেই থেকেই অমিল। বিহারীলাল মুখে তেমন প্রতিবাদ কখনো করেনি। তবু, কেমন করে যেন বুঝেছিল কর্তাবাবুরা, নিজেদের নিরাপত্তার কারণে ওকে সরানো দরকার। বিহারীলাল নির্বিবাদেই চলে এসেছিল।

তারপর চাকরির অধ্যায়। সেও আজ দশ বছর হয়ে গেল···।

চুপচাপ বসে থাকে যখন, অনেকে ফিসফিস করে। বলে, এই রেট-এ এগোলে কবে পর্যন্ত কমিশনার হবে ভাবছে। কখনো বলে, তা নয়, নতুন কিছু জাল ফেলার মতলব আঁটছে। কিছুদিন আগে বড়বাবুর সঙ্গে বেরিয়ে একবার এই নিয়ে বেশ খানিকটা হাসি ঠাট্টার খোরাক জুগিয়েছে বিহারীলাল। পথের ধারের একটা গাছতলায় দু'টি ভিখারীকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল নাকি। তাদের বয়েস ? বড়বাবুর মতে ষাটের কম নয়। স্ত্রীলোকটি মাটির ওপর পা ছড়িয়ে বসেছিল, আর পুরুষটি বিশ্রাম করছিল তার কোলে শুয়ে। স্ত্রীলোকটি পাকা চুল তুলছিল পুরুষটির মাথা

থেকে আর দুজনেই হাসাহাসি করছিল। বড়বাবু বলেন, তাই দেখেই পা দু'টো একেবারে মাটির সঙ্গে আটকে গিয়েছিল বিহারীলালের। ঘড়ি ধরে পুরো দশ মিনিট তিনি দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেছেন, কিন্তু বিহারীলালের হুঁস নেই। শেষে কাছে এসে বলেছেন, চোখের মধ্যে তো আর এক্সরের ব্যবস্থা বসানো নেই তোমার, শুধু ওটুকু দিতেই কার্পণ্য করেছেন ভগবান। কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকবে, ও দুটোকে নিয়ে হাজতে পুরে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে এসো, আমি না হয় দাঁড়াই ততক্ষণ।

এ হেন বিহারীলালকে দেখে সকলেই সেদিন আঁচ করলে, নতুন শিকারের সন্ধান পেয়েছে।

মিথ্যে নয়, পেয়েছে।

থানার থেকে বেশ খানিকটা দূরে হলেও থানা-এলাকার মধ্যেই পড়ে বস্তিটা। বস্তির মাতব্বর কানাই দাসের সঙ্গে কি করে যোগাযোগ ঘটেছিল বিহারীলালের তারাই জানে। দু'খানা রিক্‌শ'র মালিক কানাই দাস। লোক রেখে রিক্‌শ খাটায় সকাল দুপুর বিকেল রাত্তির। ইচ্ছে করলে কানাই দাস পাকা বাড়িতে থাকতে পারে এখন। অন্তত তাই ধারণা বস্তিবাসীদের। কিন্তু এতকাল এখানেই কাটিয়েছে···এখানেই কাটাচ্ছে। বছর চল্লিশ বয়েস, দিব্বি হৃষ্টপুষ্ট। বস্তির সকলে ওকে মাতব্বর মানে এমন নয়। বহু ঘর, বহু বাসিন্দা, যে যার নিজের মতে থাকে। তবু এরই মধ্যে যতটা সম্ভব নিজেকে জাহির করে চলে কানাই দাস। মনে মনে সেটা খুব পছন্দ না করলেও সামনাসামনি কেউ লাগতে আসে না বড়। আপদে বিপদে দু'পাঁচ টাকা ধারধোর পাওয়া যায়, তাছাড়া লোকটার হাতে দু' চারটে ষণ্ডমার্কা চেলাচামুণ্ডা আছে বলে গুজব।

অতএব বস্তিতে তার প্রতিপত্তি মন্দ নয়।

কানাই দাসের কেন এত রাগ বিনোদিনীর ওপর সঠিক কেউ জানে না। তবে মনে মনে আঁচ করে অনেকে। আড়ালে আবডালে রসালো আলোচনাও করে। কানাই দাসের মত মক্কেলকেও বিনোদিনী আমল দেয়নি যখন, তাহলে দিয়েছে যাকে সে লোকটা কত বেশি শাঁসালো না জানি! কিন্তু বস্তির ভালমন্দে কানাই দাসের দায়িত্ব আছে একটা। তাই দুই একজন ঋণানুগৃহীতকে নিয়ে খোলাখুলি সে বিনোদিনীকে সমঝে দিতে এসেছিল একবার। চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে বিনোদিনী প্রথমে তাদের বক্তব্য বা অভিযোগ শুনেছিল। বেশ দেখাচ্ছিল তখন তাকে। যারা এসেছিল তারাও অস্বীকার করতে পারবে না। তিরিশের ওধারে হলে হবে কি, ঝি-গিরি কি আর সাধে ছেড়েছে! নিজের দর বুঝেই ছেড়েছে। আগে বুঝলে আরো অনেক আগে ছাড়ত। যাই হোক, কানাই দাসের নীতিকথা শেষ হতে না হতে তার মুখ খুলল যখন সে এক ভিন্ন মূর্তি। স-সঙ্গী সমুখ থেকে পালিয়ে বেঁচেছিল কানাই দাস।

অভিযোগ বিহারীলালের কানে সে-ই তুলেছিল। বস্তিবাসীরা গরীব হলেও নীতি মানে—কিন্তু চোখের ওপর এমন দুর্নীতি চললে ছেলেপুলে নিয়ে সকলে ঘর করে কি করে? বস্তির হাওয়া বিষিয়ে দিচ্ছে ওই—

একটা অশ্লীল শব্দ ঠোঁটে এনেও গিলে ফেলেছিল কানাই দাস।

বিহারীলাল সবিস্তারে শুনেছে। কানাই দাসের ভেতরটা দেখতে পায়নি বা তার ক্ষোভের হেতু আঁচ করেনি, ভাবলে ভুল হবে। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। বিহারীলালের মুখভাব নির্বিকার। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার রীতি আছে সকল শাস্ত্রে।

খবরটা কে দিচ্ছে সে প্রশ্ন অবান্তর। আপাতত খবরটা পাকা হলেই হল।

কানাই দাসের উৎসাহ বাড়ে। পাকা বলে পাকা, একেবারে তালপাকা খবর। প্রায় প্রত্যেক শনি-রবিবারেই আসে ওই লোকটা, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দিয়ে যায়, নইলে ওই মাগি—মানে—ইয়ে—মেয়েলোকটার অমন পটের বিবিটির মত বসে চলে কি করে বুঝছেনই তো স্যার!

বিহারীলাল ঘাড় নেড়ে জানায়, বুঝেছে। আর, সতর্ক করে দেয়, প্রতিকার কিছু চায় তো আপাতত মুখ একেবারে সেলাই করে থাকে যেন।

—তা আর বলতে স্যার, কাক পক্ষীও জানবে না, এ কি আর ঢাক পিটোবার জিনিস! কানাই দাস বিনয়াপ্লুত।

সেই শনিবারই শাদা পোষাকে তিনজন সঙ্গী নিয়ে বস্তিতে গিয়ে হানা দিল বিহারীলাল। একেবারে সরাসরি নয়। খানিক দূরে বিপরীত দিকের একটা দোকানের দাওয়ায় বসে বস্তির লোকদের আনাগোনা লক্ষ্য করল প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে। সঙ্গীরা কিছু দূরে মোড়ের আড়ালে ট্রাকে বসে। আজ আবার কোন বেচারীর অমোঘ তুর্ভাগ্যের লিখন পড়েছে কপালে, বিরস বদনে সেই আলোচনা করছিল তারা। তু'টো পয়সা রোজগার করে চলে আসবে, এর সঙ্গে বেরুলে তো সেই আশায় ছাই।

বিহারীলাল একের পর এক সিগারেট খাচ্ছে আর দেখছে। কিন্তু দেখবেই বা কি আর বুঝবেই বা কি। মুখ তো চেনে না। নামটা শুনেছিল কানাই দাসের মুখে। কানাই দাস নাম জানল কি করে জানে না। প্রাণের গরজে জেনে থাকবে। কিন্তু বিহারীলাল

আশা করছিল মুখ দেখলে চিনবে। মুখ দেখে চেনা অভ্যেস আছে তার।....ধোপদুরস্ত দু' পাঁচজন ঢুকেছে বটে কিন্তু রাতের ঘোলাটে আলোয় ঠাওর করা যায়নি ঠিক।

ভিতরে ভিতরে একটু অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে বিহারীলাল। শেষে সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে ঘড়ি দেখল। রাত ন'টা বেজে গেছে। শিকারে এসে তোলা হাতে ফিরে যাওয়া কোষ্ঠীতে লেখেনি। গা-ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে গিয়ে সঙ্গীদের ডাকল ইশারায়। তারপর গট গট করে ঢুকে পড়ল বস্তির মধ্যে।

বস্তিবাসীরা সচকিত, বিমূঢ়। অস্ফুট গুঞ্জন উঠল একটা বস্তিময়। খোঁজ করার আগেই কানাই দাস হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে দু'হাত জুড়ে ফিস ফিস করে আপ্যায়ন জানালো, গুড্ নাইট্ স্যার!

আপনি এসে গেছেন, এক মিনিট স্যার···জাস্ট ওয়ান মিনিট!

চট করে আড়াল হয়ে গেল। ফিরে এলো তক্ষুনি। উত্তেজিত, উদ্ভাসিত। বলল, ঘরের দরজা বন্ধ স্যার! ভালো দিনে এসেছেন মনে হচ্ছে, নিশ্চয় শা—মানে—ওই শালিক বাবু এসে গেছে, একেবারে হাতে-নাতে ধরা যাবে, আসুন স্যার—!

সে অগ্রসর হল। স-সঙ্গী বিহারীলাল অনুসরণ করল। আবছা অন্ধকার, উঠোনে ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ ভীতত্রস্ত।

উঠোন পেরিয়ে দেড় হাত চওড়া একটুখানি গলি হাতড়ে ঘরের প্রবেশপথ। কানাই দাস বিহারীলালের একখানা হাত ধরে অন্য দিকে আকর্ষণ করল। চাপা গলায় বলল, ওরা ওদিক দিয়ে দরজা ধাক্কাবে'খন, আপনি এদিকে আসুন স্যার।

ইশারায় সঙ্গীদের নির্দেশ দিয়ে বিহারীলাল কানাই দাসের সঙ্গে ঘরের অন্যদিকের দেওয়ালের অন্ধকারে মিশে গেল। মাটির

দেওয়ালের কোণের দিকে বাঁশের বাতা সরানো রন্ধ্র একটা। চালা থেকে খড় ঝুলে পড়ায় বাইরে থেকে এমন কি ভিতর থেকেও হয়ত চোখে পড়ে না সেটা। ওটা আপনি হয়নি বোঝা যায়।

কানাই দাসই রন্ধ্রপথে চোখ লাগাল প্রথম। তার পরেই হতাশ বিস্ময়। অস্ফুট কটূক্তি সামলে উঠতে পারল না এবারে।

—এঃ, শালা আজ আসেনি দেখছি।

ওকে ঠেলে সরিয়ে বিহারীলাল ততক্ষণে রন্ধ্রপথে চোখ দিয়েছে।

কাঁধ উঁচু একটা থালায় ডাল দিয়ে এক কাঁড়ি ভাত মেখে তরকারী সহযোগে বিনোদিনী নিজের হাতে দুটি ছেলেকে খাইয়ে দিচ্ছে। একজনের বয়েস বছর দশ, আর একজনের বারো-তেরো। ছেলে দু'টি খুশি মেজাজে খাচ্ছে, আর বিনোদিনী খুশি মেজাজে খাইয়ে দিচ্ছে।

দেখছে বিহারীলাল।—পরনে ময়লা শাড়ি, একটু মোটার দিক ঘেঁষা আঁটসাঁট গড়ন, মুখশ্রী মন্দ নয় বটে। গরাস গরাস ভাত চালান দিচ্ছে একবার এর মুখে আর একবার ওর মুখে। আর প্রসন্ন বদনে অনর্গল বলে চলেছে কি। ঠিক কানে আসছে না বিহারীলালের, চেষ্টাও করছে না।

তার এই দেখার একাগ্রতা দেখে অন্ধকারে মুখ টিপে হাসছে কানাই দাস।

ওদিকের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হল খট্‌খট্‌ করে।

রন্ধ্রপথে চোখ রেখে বিহারীলাল ভুরু কোঁচকালো। ছেলেদের খাওয়ায় আর বিনোদিনীর খাওয়ানোয় ছেদ পড়ে গেল। ছেলে দুটি ভাতের গরাস মুখে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল দরজার দিকে।

বিনোদিনীও।....ঈষৎ বিস্ময়, ভ্রূদ্বয়ে কুঞ্চন রেখা।—কে ?

জবাবে আবার খটাখট্ কড়া নাড়ার শব্দ।

একটা ত্রস্তভাব ঘরের মধ্যে। বড় বড় ক'টা ভাতের গরাস বিনোদিনী প্রায় জোর করেই গুঁজে দিল ছেলে দুটোর মুখে। থমকে গেল এর পরেই। থালায় অনেকটা অবশিষ্ট এখনো।

ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্ !

খুলছি—।

বিহারীলাল দেখছে, মিষ্টি গলায় জবাব পাঠিয়ে খপ্ করে ভাতের কাঁসারিটা তুলে বড় ছেলেটার হাতে দিল বিনোদিনী। পাশের ঘটি থেকে উচ্ছিষ্ট জায়গায় একটু জল ছিটিয়ে হাতে করে মুছে নিল জায়গাটা। পরে ঘটিটা ছোট ছেলেটার হাতে তুলে দিয়ে তাড়াতাড়ি পিছনের দিকের দরজার শিকল খুলে দিল। কাঁসারি হাতে এবং ঘটি হাতে যেন তস্করের তৎপরতায় নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল ছেলে দুটো। বিনোদিনী দরজা বন্ধ করল আবার।

এবারে আরো জোরে নড়ে উঠল দরজার কড়া।

খুলছি, খুলছি !

কণ্ঠস্বরে সস্নেহ অনুযোগ ঝরল যেন, যার অর্থ, থামো না বাপু, দু' মিনিট আর সবুর সয় না ?

ঊর্ধ্বাঙ্গে বসন ছিল না, তাড়াতাড়ি আলনা থেকে একটা টেনে পরে নিল। ক্ষিপ্র হাতে বদলে নিল ময়লা শাড়িটাও। দেওয়ালের আয়নার তাক থেকে চট করে স্নো-পাউডার ঘষে নিল একটু। মাথায় চিরুনি বুলিয়ে দিল দুই একবার। এক মুহূর্ত থেমে আয়নায় প্রসাধনটুকু পরীক্ষা করে নিয়ে ঠোঁটে হাসির আভাস এনে এগিয়ে গেল দরজা খুলতে।

রন্ধ্র থেকে চোখ তুলে নিল বিহারীলাল। কানাই দাস সরে দাঁড়াল। বিহারীলাল এগিয়ে এলো।

উঠোনে একগাদা মেয়ে পুরুষের রুদ্ধ ও সশঙ্ক প্রতীক্ষা।

দরজা খুলেই একেবারে হকচকিয়ে গেল বিনোদিনী। বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে রইল শুধু। মুখে রক্ত নেই যেন। সঙ্গীদের ঠেলে বিহারীলাল এগিয়ে এলো মুখোমুখী। দেখল নিরীক্ষণ করে। নির্বিকার, নিরাসক্ত।

তোমার নাম বিনোদিনী ?

বোবা মুখে ঘাড় নাড়ল।

একজনের নাম করে আবার একটা পরুষ প্রশ্ন নিক্ষিপ্ত হল, ওই নামের কেউ আসে এখানে ?

জবাব নেই।

আসে—?

কণ্ঠস্বর যেন গুরু গুরু মেঘের ডাক।

ঘাড় নাড়ল, আসে।

কতকাল চলছে এই ব্যবসা ?

জবাব নেই।

ওই ছেলে ছুটো কে ?

না বুঝে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল বিনোদিনী।

ঘরে ভাত খাচ্ছিল ছেলে তুটি কে ?

অস্ফুট জবাব দিল, একজন ছেলে।

অন্য জন ?

ভাগ্নে।

তু'চার মুহূর্ত। চেয়ে আছে বিহারীলাল। খর বিশ্লেষণী তুই

চোখ।—একবার আসতে হবে সঙ্গে, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরতে পারবে।

শিকার-সহ উঠোনে এসে দাঁড়াতেই উঠোন ফাঁকা হয়ে গেল প্রায়। মেয়ে পুরুষেরা জড়সড় হয়ে মাটির ঘরের দেয়ালে দেয়ালে মিশে গেল। বিনোদিনীকে নিয়ে বেরিয়ে এলো তারা। বিহারী-লাল থমকে দাঁড়াল একটু। ইঙ্গিতে ওকে ট্রাকে তুলতে বলে ভেতরে ঢুকল আবার।

বস্তির সমস্ত মেয়ে পুরুষ ততক্ষণে আবার উঠোনে ভেঙে পড়েছে। কল-কোলাহল উঠেছে একটা। বিহারীলালকে দেখেই হকচকিয়ে থেমে গেল। বিগলিত-বদন কানাই দাস সামনে এগিয়ে এলো হন্তদন্ত হয়ে। খুশিতে উপছে উঠেছে।—খুঁজছেন স্যার?

বিহারীলাল ঘাড় নাড়ল। পরে আচমকা প্রচণ্ড এক চড় বসিয়ে দিল গালে। তিন হাত ছিটকে গিয়ে গালে হাত দিয়ে বসে পড়ল কানাই দাস। গটগট করে বিহারীলাল বেরিয়ে গেল আবার।

ট্রাক চলেছে থানার দিকে। ভয়ার্ত নারীমূর্তি ট্রাকের এক কোণে মিশে আছে।

চাপা আনন্দে বিহ্বল হয়ে সিগারেট টানছে বিহারীলাল। চোখমুখ ঝক্‌ঝক্‌ করছে। একটা অন্তর্মুখী আনন্দে বিভোর যেন।

দেখে সঙ্গীরা গা টেপাটেপি করছে নিঃশব্দে। অর্থাৎ কি এমন শিকার ধরেছে রে বাবা! নিয়ে গিয়েই তো খালাস দিতে বাধ্য—অথচ মুখখানা করেছে যেন থানায় যেতে না যেতে রাজভোগের মত মস্ত একটা প্রমোশন মুখের সামনে এগিয়ে আসবে। বড়বাবু বলেন মিথ্যে নয়, দেশসুদ্ধ লোককে গারদে এনে পুরতে পারলেই

খুশিতে ডগমগ, আর কিছু চায় না।

তন্ময় আনন্দে নতুন সিগারেট ধরালো বিহারীলাল। মাঝে মাঝে আড়চোখে দেখছে বিবর্ণ পাংশু নারী মূর্তির দিকে। খুশিতে জ্বলজ্বল করছে গোটা মুখ।...ওই ছেলে দুটোকে ভাত খাওয়ানোর দৃশ্যটা চোখে ভাসছে আর অন্তর্তুষ্টিতে বিভোর হয়ে উঠেছে।... যেমন বিভোর হয় বাল্যের রোগ-শয্যায় সেই বুড়ীর কথা মনে হলে, যেমন হয়েছিল গাছতলার সেই বুড়োবুড়ীকে দেখে।

মনের আনন্দে ভাবছে বিহারীলাল, শুধু এদেশেই সম্ভবত একদিন আর জেলখানা থাকবে না একটাও।

মদনভস্ম

শনিবার। একটা না বাজতেই কর্মচারীরা রাগে গজগজ করতে লাগল। সপ্তাহে পাঁচটা দিন তো আজকাল ন'টা-ছ'টা হচ্ছেই, শনিবারেও তিনটে পর্যন্ত আটকে রাখা হবে কেন! 'ইয়ার-এনডিং' তো তাদের কী? পয়সার বেলায় ফাউ নেই কানাকড়িও, খাটুনির বেলায় যত আব্দার! জি, এম, নিজে তো ওদিকে দিব্বি একটার সময় রেস-এ কেটে পড়বে'খন, ইত্যাদি—।

রাজ্যের বিরক্তি নিয়েই সুপারিনটেনডেণ্ট বাদল সোম ফাইলে মন দিল আবার। হাত থাকলে একটার আগেই ছেড়ে দিত সকলকে। কাজ হোক চাই না হোক। কারণ, জি, এম, অর্থাৎ জেনারেল ম্যানেজারের ওপর নিজেই সে বীতশ্রদ্ধ সব থেকে বেশি। পর পর তিন বছর তার সকল আশায় ছাই দিয়েছে ওই জেনারেল ম্যানেজার। সকাল-সন্ধ্যা কলের মত খেটেও একই চেয়ারে আটকে আছে সে। অথচ, একবার এই গণ্ডিটা পেরতে পারলে অফুরন্ত সম্ভাবনা। প্রতিষ্ঠার সিঁড়িগুলো পর পর ছকে বাঁধা। · সেলস্ অফিসার···এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার····সেলস্ ম্যানেজার··· সেক্রেটারী····কমার্সিয়াল ম্যানেজার···ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার ··। দেশময় ছড়ানো কোম্পানীর শাখা-প্রশাখা। জেনারেল ম্যানেজারের একটুখানি কলমের খোঁচায় কি না হতে পারত। কিন্তু হল না। অনেক দিন রাঙা ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে কাটিয়েছে বাদল সোম।

জেনারেল ম্যানেজার রামস্বরূপ ভাণ্ডারকার।

খামখেয়ালী মানুষ। চটপটে, ছটফটে, হাসিখুশিতে ভরপুর।

চলনে-বলনে আলগা মর্যাদার মুখোশ নেই। সময় বিশেষে বেয়ারা চাপরাশীর সঙ্গেও রসিকতা করে বসেন। কেরানীদের বিয়েতেও এক রকম যেচে নেমন্তন্ন নেন, দামী উপহার দেন নতুন বউকে। নিজেও কেরানী থেকেই আজ এই স্বুবর্ণ শিখরে উঠে বসেছেন। যোগ্যতা ছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু তার থেকেও অনেক, অনেক বেশি ছিল বিগত ম্যানেজিং-ডাইরেক্টারের বেপরোয়া পৃষ্ঠপোষকতা। গত পনের বছর ধরে ওই মানুষটি চোখ-কান বুজে তাঁকে ঠেলে তুলে নিয়ে গেলেন যেন। এমন অস্বাভাবিক ভাগ্য-বিপর্যয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ার কথা। কিন্তু সমস্ত কোম্পানীর মালিকানা পেলেও ভাণ্ডারকার বিচলিত হবার মানুষ নন বোধ করি।

এঁরই খাস তত্ত্বাবধানে চাকরি করছে বাদল সোম। উচ্চাভিলাষ দুরাকাঙ্ক্ষা নয়। কাজেও তার ফাঁক নেই, ফাঁকি নেই। কিন্তু বাসনার তীরে বসে ক'টা বছর ভাগ্যের জোয়ার-জলের কলধ্বনিই শুনল শুধু। একের পর এক বাইরের লোক এসে তার আকাঙ্ক্ষার আসনগুলো জুড়ে বসেছে। বাদল সোম আশা ছেড়েছে। নিস্পৃহ একাগ্রতায় এখন নিজের কাজটুকু সম্পন্ন করে যায়।

বড় সাহেবের তলব নিয়ে এলো বেয়ারা। বাদল সোম ঘড়ি দেখল। একটা বাজে। এখন আর জি, এম-এর মাথায় ফাইল-পত্র ঢুকবে না কিছু জানা কথা। তাহলে আবার ডাকাডাকি কেন! উঠল। চোখে-মুখে হাল্‌কা তৎপরতার পালিশ লাগল একপ্রস্থ। অনেক দিনের অভ্যাস।

কিন্তু খানিক বাদে শ্লথগতিতে নিজের জায়গায় ফিরে এলো যখন, মুখভাব সম্পূর্ণ বদলে গেছে। ভ্রূ-মধ্যে কুঞ্চন রেখা।…

চিন্তাচ্ছন্ন। বসে বসে ভাবল কিছুক্ষণ। আবার উঠল। ঘুরে ঘুরে সকলকে নির্দেশ দিল—কাজ শেষ হলে ফাইল তার টেবিলে রেখে যেতে।

রেস্ ফেরত জেনারেল ম্যানেজার ভাণ্ডারকার বাদল সোমের বাড়ি আসছেন আপিসের ফাইল 'ডিসপোজ' করতে।

খুশি হবার কথা। কিন্তু অস্বস্তি বাড়তে লাগল। বড় সাহেবের খেয়াল জানে। কিন্তু তার থেকেও বেশি কিছু জানে বলেই ভাবনা।···পাঁচ বছর হল জেনারেল ম্যানেজার হয়ে এসেছেন। স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ নেই, তিনি প্রোষিতভর্তৃকা। কিন্তু নারী-বিরহিত জীবন নয় ভাণ্ডারকারের। তাঁর দিব্যাঙ্গনা সহচরীদের দুই-এক জনকে মাঝে মাঝে আপিসেও দেখা যায়। এ ছাড়াও নানা গুজব কানে আসে।

বাদল সোমের ভাবনার কারণ, তার সহধর্মিণীটির পাশে অনেক সুদর্শনাকেই নিষ্প্রভ দেখায়। বাড়িতে এ-হেন অতিথির আবির্ভাব সুবাঞ্ছিত নয়।

পরিচিত কড়ানাড়ার শব্দটা কানে আসতে অরুণা তাড়াতাড়ি বাইরের ঘরে এসে দরজা খুলে দিল। সহাস্যে কি বলতে গিয়ে কর্তাটির পিছনে তক্‌মাপরা চাপরাশীকে দেখে থেমে গেল। কাঁধ থেকে ফাইলের বোঝা টেবিলে নামিয়ে চাপরাশী বিদায় নেবার পর অরুণা জিজ্ঞাসা করল, গোটা আপিসটাকে তুলে আনলে নাকি ?

চেয়ারে ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিয়ে বাদল সোম সংক্ষিপ্ত সমাচার জ্ঞাপন করল, বড় সাহেব এখানে আসছে এগুলো সই করতে।

শুনে অরুণাও হকচকিয়ে গেল।—বড় সাহেব মানে তোমাদের

জেনারেল ম্যানেজার ?

হুঁ। একটু চা'টার ব্যবস্থা রাখতে হবে। খুব তাড়া নেই, রেস্ ফেরত আসবে। যত ঝামেলা—

অরুণা তবু ব্যস্ত হয়ে উঠল। চাকরটা পর্যন্ত এখনো আসেনি। ঘরটাও আর একটু গুছিয়ে রাখা দরকার। কিন্তু সবার আগে সামনের বিরস মূর্তিটির দিকেই চোখ গেল আবার। কর্মক্ষেত্রে তার এতকালের পুঞ্জীভূত হতাশার আঁচ অরুণাও পায়। বলল, মুখখানা অমন হাঁড়িপানা করে বসলে কেন ? বাড়ি বয়ে আসছে যখন, দেখো, বরাত ফিরতেও পারে।

হ্যাঃ, ওকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনেছি।....সেজন্য নয়, লোকটাও এই—খুব সুবিধের নয়—।

অরুণা এবার সমনোযোগে লক্ষ্য করল তাকে। আভাসে যেন কিছু বলতে চায়। কিন্তু আর সাড়া না পেয়ে নিজেই বলল, কাজের চাপে আপিসে রোজ সন্ধ্যে পর্যন্ত আটকায়, একদিন না হয় বাড়ি এসে আটকাবে। এতে আর সুবিধে অসুবিধের কি আছে ?

বাদল সোম বিরসবদনে জবাব দিল, একদিন তুমি জানছ কি করে ? আজকেই তো আর বছর শেষ নয়, কাজের চাপ এখন তিন মাস ধরে চলবে। এর পর প্রত্যেক শনিবারেই হয়ত এসে হাজির হবেন মূর্তিমান।

বিরাগের হেতুটি এতক্ষণে স্পষ্ট হল অরুণার কাছে। আগেই বোঝা উচিত ছিল। মানুষটার এ দুর্বলতা অজ্ঞাত নয়। এ নিয়ে কখনো রাগ করেছে, কখনো বা তাকে রাগাবার জন্য তারই বন্ধু-বান্ধবের প্রতি প্রকাশ্য অন্তরঙ্গতায় মুখর হয়ে উঠেছে। হাসি চেপে বেশ নিরীহ মুখে প্রশ্ন করল, তা এলেই বা…চা চিনি বেশি খরচ

হবে বলে ভাবচ ?

ঠাট্টার এ সুরটা বাদল সোম চেনে। মেজাজ চড়ল।—শুধু চা চিনি কেন, ঘরের বউ সুদ্ধ খরচ হয়ে যেতে পারে। লোকটাকে তো চেনো না—।

তোমার বউ ? আরো বেশি বোকা সাজতে গিয়ে অরুণা সোম জোরেই হেসে ফেলল। হাসি আর থামে না। পরে একটু সামলে নিয়ে বলল, লোকটা যখন এমন, তোমার বুদ্ধি থাকলে অনেক আগেই আমাকে একটু ছেড়ে দিতে—। হাসতে হাসতে ঘর ছেড়ে পালালো সে।

যথাসময়ে দোর-গোড়ায় মোটর-হর্ন শোনা গেল। গৃহস্বামী পড়ি মরি করে ছুটে এলো। ভাণ্ডারকার ঘরে এসে বসলেন। তেমনি ব্যস্ত-সমস্ত। ফাইলের স্তূপ দেখে অস্ফুট কটূক্তি করলেন একটা। হাত ঘড়িতে সময় দেখে বললেন, দু'ঘণ্টায় সব পার করে দেব, বসে যাও—।

বাদল সোম আবেদন জানালো, তার আগে একটু চা—

ভাণ্ডারকার মাথা ঝাঁকালেন।—কিচ্ছু না। রেসে গলা পর্যন্ত হেরে রেস্তঁরায় গলা পর্যন্ত ঠেসে এসেছি। কিছু গলবে না। দেরি কোরো না, হারি আপ্—! পকেট থেকে কলম বার করলেন তিনি।

বাদল সোম একদিকে যেমন একটু নিশ্চিন্ত হল, অন্য দিকে এক পেয়ালা চা-ও খাওয়ানো গেল না দেখে কেমন খুঁত খুঁত করতে লাগল। কিন্তু লোকটার কথা বলার ধরনই এমন যার ওপর আর কোন কথা চলে না। মুখোমুখি বসে তাড়াতাড়ি ফাইলের স্তূপ টেনে নিল সে।

ভিতরের আড়াল থেকে অরুণা বড় সাহেবকে দেখার লোভ

সংবরণ করতে পারেনি। মুখের টকাটক্ বাংলা শুনেও বেশ অবাক হল। কিন্তু হাসি পেয়ে গেল স্বামীটির এই বিনয়-বিনম্র মুখচ্ছবি দেখে। এ যেন আলাদা মানুষ।

ফাইলের পর ফাইল ওলটানো হচ্ছে এঘরে। ভাণ্ডারকার শিস দিচ্ছেন, মন্তব্য লিখছেন, মাঝে মাঝে এটা-ওটা জিজ্ঞাসা করছেন, সব শেষে সই করে ফাইল ঠেলে দিচ্ছেন আর একদিকে। বাদল সোমও তন্ময়।

হঠাৎ দোর-গোড়ায় শিশুর খিল্‌খিল্ হাসির শব্দে ভাণ্ডারকারের কলম থেমে গেল। বাইরে থেকে দু'খানি শুভ্র নিটোল বাহু তাকে আটকাতে চেষ্টা করেও পারল না। টলতে টলতে এবং পড়তে পড়তে ক্ষুদ্রকায় শিশু ঘরে প্রবেশ করল। খালি গা, মুখে বুকে দুধের দাগ। দুধ খেতে খেতে এক ফাঁকে মায়ের হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে আসছে। একটু নিরাপদ ব্যবধানে এসে পরম কৌতুকে ঘাড় কাত করে সে অনুসরণকারিণীর দূরত্বটুকু বুঝে নিতে চেষ্টা করল।

এদিকে ছেলের বাবা ছেলেকে একটা তাড়া দেবে কিনা ঠিক বুঝে উঠছে না। কারণ ভাণ্ডারকার সাগ্রহে দৃশ্যটি দেখছেন চেয়ে চেয়ে। টক্ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে ছেলেটিকে যেন লুফে নিয়ে এলেন তিনি। টেবিলে ছড়ানো কাগজপত্রের ওপরেই তাকে বসিয়ে দিলেন। হঠাৎ এভাবে আক্রান্ত হবার জন্য শিশুটি প্রস্তুত ছিল না। ঘাড় ফিরিয়ে বাবাকে হাসতে দেখে তবু কিছুটা আশ্বস্ত হল।

ভাণ্ডারকার উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়লেন যেন, তোমার ছেলে?

ছেলের বাবা ঘাড় নাড়ল, তারই বটে।

এবারে বসে বসেই দু'হাতে তিনি শিশুটিকে একেবারে মাথার ওপর তুলে ফেললেন। ছোটখাট ঝাঁকুনি দিলেন গোটা দুই। কোলের ওপর নামালেন। রুমাল বার করে মুখ এবং বুকের দুধের দাগ মুছে দিতে দিতে আনন্দসূচক শব্দ করে উঠলেন একটা।

ডাগর দু'টি চোখ মেলে ছেলে নিরীক্ষণ করে দেখতে লাগল তাঁকে। তাৎপর্য, খারাপ লাগছে না, কিন্তু জীবটি তুমি কে হে বাপু?

আর একদফা আদরের চোটে ব্যতিব্যস্ত হয়েও এবারে সে কলোচ্ছ্বাসে হেসে উঠল। ভাণ্ডারকার চেয়ারের হাতলের ওপর বসালেন তাকে। দেখলেন আবার। সোমের দিকে তাকালেন। ঈষৎ বিস্ময়ে বলে বসলেন, তোমার তো দেখছি আমার মতই হত-ভাগা মার্কা চেহারা, কিন্তু—। হেসে ফেললেন, আচ্ছা, তোমার বউ দেখব, ডাকো তাঁকে—।

—চার আঙুল জিব কেটে দরজার আড়াল থেকে অরুণা সরে পড়ল।

বিব্রত হাস্যে ঘাড় নেড়ে বাদল সোম তাড়াতাড়ি ভিতরে এসে খবর দিল।—ব্যাটা ঠিক ডেকেছে, জানতুম ডাকবে, একবার এসো।

অরুণার রাগও হচ্ছে, হাসিও পাচ্ছে।—যাব না যাও, ওই দস্যি ছেলের জন্যেই তো!

কিন্তু না এসে উপায় নেই। ছেলে কোলেই শশব্যস্তে দাঁড়িয়ে উঠলেন ভাণ্ডারকার—গুড ইভনিং ম্যাডাম, গুড ইভনিং! বোসো, বোসো—। ডেকে বিরক্ত করলাম না তো?

স্মিত হাস্যে অরুণা জবাব দিল, না বিরক্ত হব কেন—।

ভাণ্ডারকারের দুই চোখ তার মুখের ওপর সংবদ্ধ থাকে

কিছুক্ষণ। পরে সোৎসাহে হাসতে লাগলেন তিনি।—দেখলে সোম, আমার ইমাজিনেশান্! তোমার এমন ছেলে-বউ অথচ আমি জানতুম না তো!

বাদল সোম মনে মনে কটূক্তি করল একটা। মুখে হাসল। ওদিকে শিশুটির ভারী ইচ্ছে, টেবিলের ওপর থেকে সাহেবের ঝক-ঝকে কলমটা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে দেখে। সেদিকে হাত বাড়াতে অরুণা কলম তুলে নিয়ে মালিকের হাতে দিল। পরে সহজ হাস্যে জিজ্ঞাসা করল, একটু চা আনি?

চা—। চা ভালো জিনিস, আনো—কিন্তু শুধু চা।

অরুণা উঠে গেল। ভাণ্ডারকারের চোখ দু'টো অনুধাবন করল তাকে। বাদল সোম দেখল।

বুড়ো চাকর চায়ের ট্রে পৌঁছে দিতে ছেলেটি এবার তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আজ তাকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়নি সেটা এতক্ষণে খেয়াল হল বোধ হয়। অরুণা চা ঢেলে দিল। ভাণ্ডারকার একাই আসর জমিয়ে রাখলেন অনেকক্ষণ। এত বড় অফিসারের লঘু চপলতায় অরুণা বেশ জোরেই হেসে উঠছে এক একবার। কথা বিশেষে হাল্কা মন্তব্যও করল দু'চারটে। ভাণ্ডার-কার খুশিতে আটখানা। তৃতীয় ব্যক্তিটির নীরবতা লক্ষ্য করেই বোধ হয় আত্মস্থ হলেন একটু।—কি হে সোম, তুমি যে একেবারে ঠাণ্ডা মেরে গেলে! আচ্ছা ম্যাডাম, আর তোমাকে আটকে রাখব না। কাজে বেশি ফাঁকি দিলে সোম আবার রেগে যায়।

সোমের বিব্রত ভাবটুকু নয়নাভিরাম। অরুণা হাঁফ ফেলে বাঁচল। অতিথিকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে প্রস্থান করল সে। ভাণ্ডারকারের দু'চোখ দরজা পর্যন্ত অনুসরণ করল আবারও।

এবং এবারেও সেটুকু বাদল সোমের দৃষ্টি এড়ালো না।

ফাইল পার হল, একটা, দু'টো।—ভাণ্ডারকার উস্‌খুস করতে লাগলেন কেমন। অন্যমনস্কে ভিতরের দরজার দিকে তাকালেন একবার। সামনের মানুষটির সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় হল। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন হঠাৎ।—আজ আর ভাল লাগছে না, সোমবার আপিসে দেখা যাবে। গুড নাইট। সোজা গাড়িতে এসে উঠলেন তিনি।

বাদল সোমের অনুমান মিথ্যে নয়। পরের শনিবারে ভাণ্ডারকার আবার এলেন আপিসের ফাইল 'ডিস্‌পোজ' করতে। তার পরের শনিবারেও। আর এও বোঝা গেল, বছর শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্তত প্রতি শনিবারেই রেস্‌-ফেরত এখানে আসবেন তিনি। ভাণ্ডারকার ছেলের জন্যে আনেন দামী খেলনা, টফির বাক্স, বিস্কুটের টিন। তাকে কাঁধে চড়িয়ে ছেলে মানুষের মতই হৈ-চৈ করেন। বন্য উৎসাহে মেতে ওঠে দুরন্ত ছেলে, ভাণ্ডারকারের উল্লাস তাকে ছাপিয়ে যায়।

খানিক বাদে অরুণা আসে। আসতে হয় বলে আসে। ভাণ্ডারকারের প্রাণ-প্রাচুর্য উপছে ওঠে যেন। বাদল সোমের মনে হয়, হাস্য-কৌতুকের আড়ালে অনাবৃত দু'টো চোখ নারীদেহের সর্বাঙ্গ লেহন করছে থেকে থেকে। অরুণা চলে গেলে খোলা ফাইলের দিকে চেয়েই অন্যমনস্কের মত মৃদু মৃদু হাসেন রামস্বরূপ ভাণ্ডারকার। সই করেন।...দেখেও, না দেখেও।

যা বোঝবার বাদল সোম বুঝে নিল। সহসা আবিষ্কার করল তারও ভিতরে ভিতরে একটা বোঝা-পড়া চলেছে কিসের।

অবচেতন মনের অস্পষ্ট ইশারা।

কান পেতে শোনে।

হিংস্র রোষে নির্মূল করে ফেলতে চায় সেটা।

কিন্তু আবার শোনে।

আবারও।

অস্বস্তি বাড়ে। অশান্তিও ·· রাতের নিভৃতে কল্প-নিবাসীদের আনাগোনার বিরাম নেই।

কিন্তু কে ওরা ?

কান গরম, মাথা গরম হয়ে উঠছে। সাহস করে শেষ পর্যন্ত অন্তস্তলে দৃষ্টি প্রসারিত করে দেয়। অস্পষ্টতার পরদাটা মুহূর্তে অপসৃত হয়ে যায় যেন। বিস্ফারিত হয়ে দেখে, তারা আর কেউ নয়, তারা ছোট-বড় নানা সম্ভাবনার উজ্জ্বলাসনে সমাসীন বাদল সোম।

····সেলস্ অফিসার !

····এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার !

···সেলস্ ম্যানেজার !

···সেক্রেটারী !

····কমার্সিয়াল ম্যানেজার !

····ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজাব !

দ্বন্দ্ব ঘোচে। হালকা নিশ্বাস পড়ে। ক্ষতি কী। একটুখানি অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য বই তো কিছু নয়। আর বিনিময়ে ?···রোমাঞ্চ জাগে। না, আর তার স্থৈর্য বিড়ম্বিত হবে না। পাশে ছেলে বুকে আগলে অরুণা ঘুমুচ্ছে। ভারী ইচ্ছে হল তাকে আদর করে একটু। কিন্তু থাক, জেগে যাবে। বাদল সোমও ঘুমালো। নিশ্চিন্ত ঘুম।

অরুণা দেখল, একটা খুশির ছোঁয়ায় মানুষটা যেন বদলাচ্ছে দিনকে দিন। কিন্তু ঠিক বুঝে ওঠে না। গল্প শোনে। বড় সাহেবের

খামখেয়ালীর গল্প। ছেলেটার ওপর নাকি ভারী মায়া পড়ে গেছে, আপিসে রোজ একবার করে অন্তত জিজ্ঞাসা করেন তার কথা। ···আর অরুণারও প্রশংসা করেন খুব।

অরুণা ভুরু কুঁচকে টিপ্পনী কাটে, প্রশংসা ধুয়ে জল খাব, প্রোমোশান্ দেবে—?

তা, প্রোমোশান এবারে একটা দেবে।

অরুণা অবাক। কর্মোন্নতির প্রসঙ্গে এমন উচ্ছ্বাসহীন নিশ্চিত জবাব আগে কখনো শোনেনি।

শনিবার আসে। অতিথি সংবর্ধনার খরচ বাড়ে। যথাসময়ে বাড়ির দরজায় পরিচিত মোটর-হর্ন শোনা যায়। কিন্তু বাদল সোম কি একটা হিসেব নিয়ে বসেছে। শশব্যস্তে অরুণাকে তাড়া দেয়, ডেকে এনে বসাও, আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।

অরুণা বিব্রত মুখে ফিরে তাকায় তার দিকে। কিন্তু ওদিকে আবার হর্ন বাজছে। মাথায় কাপড় তুলে দিয়ে তাড়াতাড়ি অতিথি-অভ্যর্থনায় বেরিয়ে আসতে হয় তাকে। বাদল সোম নিবিষ্ট মনে হিসেব দেখছে। ··হিসেবে অনেক ভুল করেছে এতকাল।

পরের তিন মাসের মধ্যে কতগুলো সুযোগ দেখা দিল। কোনটা স্ব-নিয়ন্ত্রিত, কোনটা বিধি-প্রদত্ত।

··কর্মচারীদের বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠানে বাদল সোম সস্ত্রীক এসেছে এবার। সামান্য সুপারিনটেনডেণ্ট-পত্নীর প্রতি বড় সাহেবের প্রীতি-উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করে ছোট-বড় অফিসারদের অনেকেরই দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল। নিজের নিজের গৃহিণীদের দিকে চেয়ে ভাবলেন হয়ত, সময়কালে আর একটু দেখেশুনে বিয়েটা করলে হত।

পরের যোগাযোগটা অন্য রকমের। আপিসে বড় সাহেবের চাপরাশীকে কাছে পেয়ে একটা কাজের ভার দিতে গিয়ে বাদল সোম শুনল, তার সময় নেই, আপাতত সে যাচ্ছে তার সাহেবের জন্য সিনেমার টিকিট কাটতে। চলে যাচ্ছিল, কি ভেবে বাদল সোম তাকে ফেরাল আবার। নিস্পৃহ প্রশ্নে জেনে নিল, কোন্ সিনেমা, ক'টার শো, ক'টা টিকিট কাটছে—। ঘণ্টাখানেক বাদে নিজের চাপরাশীকে পাঠিয়ে দিল নির্দেশ মত দু'টো টিকিট কেটে আনতে। পাঁচটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সি হেঁকে বাড়ি ফিরল। অরুণাকে বলল, চলো একটা সিনেমা দেখে আসি।

সিনেমা! অরুণা অবাক।

হ্যাঁ, শীগগির তৈরী হয়ে নাও, সময় নেই···ভালো বই শুনছি।

ছেলের জন্যে ভাবনা নেই, সে পুরানো চাকরের কাছেই বেশ থাকে।

ইণ্টারভ্যালের সময় বাদল সোম হলের চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগল। অরুণা জিজ্ঞাসা করল, কাউকে খুঁজছ?

জবাব পেল না। শোনেইনি। আলো নিভল। শো আরম্ভ হল। যৌবন-প্রাচুর্যভরা বিলিতি নাচগানের হাল্‌কা ছবি। কিছু-ক্ষণের মধ্যেই হাঁপিয়ে উঠল অরুণা। বিরক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে দেখে গালে হাত দিয়ে কি ভাবছে মানুষটা। অন্তত, ছবি যে দেখছে না এটা বেশ বোঝা যায়। কিছু দিনের মধ্যে অনেক পরিবর্তনই লক্ষ্য করেছে অরুণা। ছবির পরদায় চোখ রেখে ভাবতে লাগল।

শো ভাঙতে ভিড়ের মধ্যে তারাও আস্তে আস্তে বাইরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। অরুণার আবারও মনে হল, নীরব আগ্রহে স্বামীটি

কাকে যেন খুঁজছে।

নিষ্ক্রমণ-পথে ভাণ্ডারকারই তাদের আবিষ্কার করলেন দোতলার মাঝ-সিঁড়ি থেকে। হাঁক দিলেন, হ্যালো সোম! ' একে ঠেলে ওকে ফেলে হুড়মুড় করে নেমে এলেন তাদের কাছে।—ম্যাডাম, হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেছ, এই জন্যেই সোমের আপিসের কাজ এগোয় না! হাসির শব্দে আশেপাশের লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল।

অকস্মাৎ একটা নির্মম উপলব্ধি ক্ষণকালের জন্য যেন আড়ষ্ট করে ফেলল অরুণাকে। আড়চোখে দেখে, একজনের প্রতীক্ষা সার্থক হয়েছে। সামলে নিল। হাসলও। হাসি পাচ্ছে।

বড় সাহেবের সঙ্গী এবং সঙ্গিনীরা এসে যোগ দিলেন। তিন জোড়া ঝক্‌ঝকে নারী-পুরুষ। অরুণার সঙ্গে সাড়ম্বর পরিচয় ঘটল তাঁদেরও। ভাণ্ডারকারের প্রস্তাব মত আবার সকলকে প্রবেশ করতে হল সিনেমা-সংলগ্ন বার-রেস্তোরাঁয়। সম্মিলিত হাস্য-গুঞ্জনের মধ্যেও বাদল সোমের দৃষ্টি নিবদ্ধ অপর তিনটি মহিলার প্রতি।.... বিগত-শ্রী নয়, বিগত-যৌবনা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। ওজনে তার দিকটাই অনেক ভারী।

রাস্তার উল্টো দিকে সারি সারি মোটর দাঁড়িয়ে। সঙ্গী এবং সঙ্গিনীরা বিদায় নিলেন। নিজের গাড়ির দরজা খুলে দিলেন ভাণ্ডারকার, এসো ম্যাডাম, তোমাদের পৌঁছে দিই।

মোটর ছুটেছে। এ পাশে বাদল সোম, মাঝখানে ভাণ্ডারকার এবং ওদিকের কোণে অরুণা। স্বল্প পরিসর। সপ্রগল্‌ভ সান্নিধ্য। ভাণ্ডারকার মুখর হয়ে উঠলেন আবার। অরুণার কানে ঢুকছে না এক বর্ণও। একটা নগ্ন প্রত্যাশার আঁচ এসে যেন সারা গায়ে বিঁধছে তার।

বাড়ি ফিরে অরুণা শাদাসিধে প্রশ্ন করল, তোমাদের বড় সাহেবও ছবি দেখতে আসছে এ তুমি আগেই জানতে তো ?

বাদল সোম শুকনো মাটিতে আছাড় খেল যেন। স্বীকার করল, জানত। হেসে সঙ্কোচ কাটাতে চেষ্টা করল, লোকটা আসলে কিন্তু খারাপ নয়, মিশে দেখছ তো—।

তার চোখে চোখ রেখে অরুণা শান্ত-মুখেই মাথা নাড়ল।

দেখছে। ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস। আরো অনেক কিছু দেখছে। ক্ষুদ্র জবাব দিল, নিজের বৌকে দেশে ফেলে রেখে আর পাঁচটা মেয়ে নিয়ে এখানে ফুর্তি করে বেড়াচ্ছে এই বা এমন কি খারাপ।

দিন কতক পরে।

বড় সাহেবকে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ করে এসেছে বাদল সোম। বাঙালী খানা খানা করে লোকটা নাকি পাগল।

অরুণার হাতের কাজ থেমে গেল। নিঃশব্দে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের বড় সাহেব মাইনে পান কত ?

....হাজার চারেক হবে। কেন ?

অরুণা হাসল, আর তুমি পাঁচশ'ও না, দিনকাল বদলে গেল দেখছি—কোন্ দিন আবার না বাঙালী খানার জন্য সাহেব তার আরদালীকে ধরে বসে।

দুর্বলতা আছে বলেই কটাক্ষ সহ্য হল না। রুক্ষ কণ্ঠে জবাব দিল, ছেলেটার মায়ায় বাড়ি আসে যখন তখন, নইলে ওঁর মত লোক আসাটা ইয়ারকির কথা নয়।

অরুণা জবাব দিল, মায়াটা ছেলের ওপর না ছেলের মায়ের

ওপর ভালই তো জানো। ঠিক আছে, নিয়ে এসো, স্পেশাল কি রাঁধব বলো, কল্‌জের কালিয়া? হাসতে হাসতেই প্রস্থান করল অরুণা।

নেমন্তন্নও সুসম্পন্ন হল। কিন্তু এখানেই শেষ নয়।

দিন যায়। বছর শেষ হয়ে এলো।....প্রতীক্ষারও শেষ লগ্ন। ঘরের মধ্যে ক্রমশ একটা ব্যবধান সৃষ্টি হচ্ছে বাদল সোমও উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু লোভ-দানবের হাতে চলার লাগাম, থামবে কি করে। দু'দিন বাদে সেলস্ অফিসার হতে যাচ্ছে।... সবে সুরু।

শনিবারের বিকেল। ছেলেটা সেই থেকে বিরক্ত করছিল বলে তাকে চাকরের সঙ্গে বেড়াতে পাঠিয়ে দিয়েছে অরুণা। ঘড়ি দেখল। আদরের অতিথি একটু বাদেই এসে পড়বেন জেনেও মানুষটা এখনো ফেরেনি। আপিসের বেয়ারা একখণ্ড চিরকুট এনে হাতে দিল। মর্মার্থ, বিশেষ জরুরী কাজে আটকে গেছে, ফিরতে একটু দেরি হবে। বড় সাহেবের অভ্যর্থনায় যেন ত্রুটি না হয়, এবং তার ক্ষণকালের অনুপস্থিতি তিনি যেন মার্জনা করেন।

...চার হাজার টাকা মাইনের বড় সাহেব বাড়ি আসবে জেনেও আপিসের পর কাজে আটকে গেছে। অরুণা বাইরের ঘরেই গুম হয়ে বসে রইল।—কতক্ষণ ঠিক নেই। মোটর-হর্ন শুনে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। পরনের আধময়লা শাড়িটাও বদলানো হয়নি। সময়ও পেল না। চিরাচরিত ব্যস্ততায় অতিথি ঘরে ঢুকে থমকে গেলেন। আটপৌরে বেশে অরুণার এ রূপটাও অপরূপ লাগল চোখে।

চেয়ার টেনে বসলেন। সহাস্যে বললেন, তুমি আমাকে যাদু

করেছ ম্যাডাম, কিন্তু মুখ শুকনো কেন, শরীর ভালো তো ?

অরুণা স্মিত মুখেই জবাব দিল, ভালই তো আছি—। বসল।

সোম কোথায় ?

অরুণা চিরকুটটা বাড়িয়ে দিল।

পড়ে ভাণ্ডারকার অস্ফুট ব্যঙ্গোক্তি করলেন,—খুব কাজের লোক ! ছেলের সাড়া পাচ্ছি না কেন, সেও নেই নাকি ?

এবারেও সপ্রতিভ জবাব দিল অরুণা, এমন হবে কে জানত, ছেলেকে আগেই বেড়াতে পাঠিয়ে দিয়েছি।

ভাণ্ডারকার সকৌতুকে চেয়ে থাকেন তার দিকে।

অস্বস্তিকর মৌন মুহূর্ত দু'চারটে….।

উঠে গিয়ে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এলো অরুণা। চায়ের আড়ালে তবু সময় কাটল কিছুক্ষণ। কিন্তু কতক্ষণ আর। বড় সাহেব যেন চুপ করে থেকেই মজা দেখছেন আজ। জোর করেই সহজ দৃষ্টি মেলে তাকালো অরুণা। মৃদু মৃদু হাসছেন তিনি। চোখ দু'টো হাসছে আরো বেশি। হাসছে, না কামনায় জ্বলছে ঠিক বুঝে উঠল না অরুণা।….অসহ্য লাগছে। এরকম একটা পরিবেশে অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে।

কিন্তু সত্যিই ঘটল না কিছু। চাকরের কাঁধে চড়ে ছেলে ফিরল। দূর থেকেই সাহেবের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। একটু বাদে বাদল সোমও শশব্যস্তে ঘরে প্রবেশ করল। বিনীত কৈফিয়তের মুখেই ভাণ্ডারকার তাকে থামিয়ে দিলেন।—ঠিক আছে, ঠিক আছে, সময় বরং ভালই কেটেছে আমাদের, কি বলো ম্যাডাম ?

সশব্দে হেসে উঠলেন তিনি। দুরন্ত শিশু মুখভঙ্গী করে

হাসিটা নকল করতে চেষ্টা করল তৎক্ষণাৎ। ভাণ্ডারকার আবারও স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে ফেটে পড়লেন যেন।

অরুণা আচ্ছন্নের মত বসে আছে।

ভাণ্ডারকার বিদায় নিয়ে গেলে বাদল সোম সাগ্রহে কাছে সরে এলো।—সাহেব রাগ করেনি তো?

অরুণার চোখ দু'টি তার মুখের ওপর স্থির নিবদ্ধ থাকে বেশ কিছুক্ষণ।—না, রাগ করবে কেন, ছেলেটা পর্যন্ত বাড়ি ছিল না, বেশ খুশিই হয়েছে।...তা, তুমি এতটা সময় কাটালে কি করে, পার্কে ঘুমিয়ে?

এভাবে আক্রান্ত হয়ে বাদল সোম রাগতে চেষ্টা করল।—তার মানে?—কিন্তু কণ্ঠস্বর ক্ষীণ শোনাচ্ছে।

কথা কাটাকাটি করতেও রুচিতে বাধছে অরুণার। নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে চলে গেল সে।

রাত্রি। বাদল সোম জানে অরুণা জেগে আছে। নিজের অজ্ঞাতে একটা বিষণ্ণ শূন্যতা উপলব্ধি করছে কেমন। আগেও করেছে। কিন্তু মাঝখানের ক্ষুদ্র ব্যবধানটুকু অতিক্রম করা সহজ নয়। আজ আরও দুরূহ। বিরক্ত হয়েই অন্য চিন্তায় মন দিল। প্রতিষ্ঠার স্বপনচারিণী দূতীদের আনাগোনায় শূন্যতা ভরাট হতে লাগল।...সেলস্ অফিসার...অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার... সেক্রেটারী...

* *

কিন্তু এবারেও হল না প্রোমোশান।

বাদল সোম স্তব্ধ, হতভম্ব!

এ মর্মস্পর্শী আশাভঙ্গের জের সামলাতে সময় লাগবে।

বিস্মিত অরুণাও কম হয়নি। কর্মোন্নতির সম্বন্ধে সেও নিঃসংশয়ই ছিল। রুক্ষ শুষ্ক পাণ্ডু মূর্তিটি দেখে হিংস্র আনন্দে অরুণা ডগমগিয়ে উঠল যেন। সান্ত্বনা দেবে ?··· বলবে স্ত্রীর রূপ বিকালো না বলে দুঃখ কোরো না ?

বাক্-বিনিময় আগে থেকেই প্রায় বন্ধ ছিল। এবারে নিঃসীম নীরবতায় কাটল ক'টা দিন।

সকালের দিকে সেদিনও খবরের কাগজে মানুষটির মুখ ঢাকা। একজন পুরানো বন্ধু কি উপলক্ষে বিকেলে তাদের চায়ের নেমন্তন্ন করে গেল। আগ বাড়িয়ে এসে সানন্দে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করল অরুণা। যাবে বই কি, নিশ্চয় যাবে তারা। বন্ধু চলে যেতে কঠিন দূরত্ব রেখেই অরুণা অন্য কাজে মন দিল।

কেউ কিছু না বলে দিলেও যথাসময়েই আপিস থেকে ফিরল বাদল সোম। চাকরের জিম্মায় ছেলে রেখে নীরবে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেল দু'জনে। ফিরলও নীরবে। কিন্তু বাড়ির কাছে এসে থমকে গেল তারা।

দোর-গোড়ায় বড় সাহেবের মোটর দাঁড়িয়ে।

এ মানুষটি আর এখানে পদার্পণ করতে পারেন এ তারা স্বপ্নেও ভাবেনি। বাইরের ঘর থেকে একটা কল-কোলাহল কানে আসছে। ঘরে প্রবেশ করে বিস্ময়ে বিস্ফারিত দু'জনেই।

জেনারেল ম্যানেজার রামস্বরূপ ভাণ্ডারকার চার হাত-পায়ে ঘোড়া হয়ে সমস্ত মেঝে চরে বেড়াচ্ছেন, এবং ছেলে তাঁর পিঠে চেপে বসে প্রবল বিক্রমে সেই মানব-অশ্বটিকে চালাচ্ছে।

দৃশ্য দেখে অরুণা হেসে ফেলল। অশ্বরূপী ভাণ্ডারকার হ্রেষা-রবে আনন্দ জ্ঞাপন করলেন। দুরন্ত শিশু মত্ত আনন্দে ক্ষুদ্র

দু'পায়ে ঘোড়ার পাঁজরে বেপরোয়া ঠোক্কর চালাতে লাগল।

অরুণা দৌড়ে এসে পিঠ থেকে টেনে নামালো তাকে। বাঁদর ছেলে, লাগবে যে!

ভাণ্ডারকার সহাস্যে উঠে দাঁড়ালেন। বাদল সোম নীরব, নিস্পন্দ। একখণ্ড ইস্পাতের মত হঠাৎ অরুণার সমস্ত মুখখানি ঝক্‌মকিয়ে উঠল যেন। চকিতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল একবার তার দিকে। পরে উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে উঠল, কি কাণ্ড! কতক্ষণ এসেছ সাহেব? বোসো—। এঃ! প্যাণ্টটা একেবারে গেছে।

নতজানু হয়ে নিজের হাতে প্যাণ্ট ঝেড়ে দিল। রোসো, চা বলে আসি। প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল। ফিরেও এলো তক্ষুনি। কাছেই একটা চেয়ার টেনে বসল। —তুমি আসবে আজ কে জানত, তাহলে কক্ষনো বেরুতাম না। তাঁর কোল থেকে ছেলেকে নিজের কোলে টেনে নিল অরুণা।

বাদল সোম স্থাণুর মত বসে।

ভাণ্ডারকারও বিস্মিত হচ্ছেন।

একাই অজস্র কথা বলছে অরুণা। নেমন্তন্নের কথা, ছেলের দুরন্তপনা, ঘোড়া হওয়ার প্রসঙ্গে বড় সাহেবের ঘোড়া-রোগ নিয়ে ঠাট্টা, ইত্যাদি।

চাকর চা রেখে ছেলে নিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ—।

অরুণাও চুপ করে গেল এক সময়।

...অখণ্ড নীরবতা।

ভাণ্ডারকার আপন মনেই হাসছেন একটু একটু। চোখ তাঁর বাদল সোমের মুখের ওপর। মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন,

প্রমোশান পাওনি বলে দুঃখ হচ্ছে ?

বাদল সোমের মাথা টেবিলের ওপর নুয়ে এলো প্রায়। অরুণা নির্বাক। মন চাইছে ঘর ছেড়ে চলে যেতে। পারছে না।

ভাণ্ডারকার শূন্য চায়ের পেয়ালাটা নাড়াচাড়া করলেন দুই-একবার। ভাবলেন একটু। হাসলেনও। তারপর অনুচ্চ কণ্ঠে উদ্ঘাটন করলেন আপন জীবনের একটুখানি অনাবৃত ইতিহাস।··· কেরানী ছিলেন, আজ জেনারেল ম্যানেজার হয়েছেন। কিন্তু ঠিক এমনি নয়, দাম দিয়ে।

থামলেন একটু। তেমনি শান্ত-মুখেই বললেন আবার, আমার একটা অভিজ্ঞতা তোমার কাজে লাগতে পারে···টেক্ ইট্ ফ্রম মি মাই ডিয়ার বয়, জেনারেল ম্যানেজারীর থেকেও তোমার ওই স্ত্রীটির মূল্য অনেক বেশি। প্রমোশান পেলে কথাটা তোমার মনে থাকত না।

ঘড়ি দেখলেন।—আচ্ছা, গুড বাই। হাল্কা শিস্ দিতে দিতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন তিনি। চকিতের জন্য মানুষটির অন্তস্তল পর্যন্ত দেখা গেল যেন। সর্বগ্রাসী শূন্যতা আর সাহারার তৃষ্ণা।

বোবা নৈঃশব্দে ঘরটা ভরে উঠেছে।

প্রতিটি মুহূর্ত যেন মুগুরের ঘা দিচ্ছে বাদল সোমের বুকে। মুখ তুলল। অরুণা মূর্তির মত বসে।

কঠিন ব্যবধান।

ছেলে ঘরে প্রবেশ করল। হেলে-দুলে এসে দাঁড়াল দু'জনের মাঝখানে। সকৌতুকে নিরীক্ষণ করে দেখতে লাগল দু'জনকেই।

একবার বাবাকে, একবার মা'কে। সন্তর্পণে একটা নিঃশ্বাস উন্মোচন করল বাদল সোম।

অরুণার মুখে স্নিগ্ধ মাধুর্য নেমে আসছে আবার।

ব্যবধান অনতিক্রমণীয় নয়।

মাঝে ক্ষুদ্র শিশু।

ক্ষুদ্র সেতুবন্ধ।

মহুয়াকথা

টেলিফোনে আগেই খবরটা পেয়েছিল অমরেশ।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। রমাপতির পরে স্ত্রী নিরুপমাও ফোন করেছে। জানিয়েছে, ডাক্তার চলে যাবার পরে সে নিজের ঘরে চলে এসেছে। নিজের ঘরে মানে নিচের তলায়। বলেছে, হাজার হোক ভাশুর মানুষ, তাঁর সামনে সে এ ধরণের রোগী আগলে বসে থাকে কি করে! অস্বস্তি লাগে বাপু যাই বলো—।

কারখানায় বসে অমরেশ মাল চালান পাঠাচ্ছিল আর ভাবছিল। পার্টির অর্ডার এবং অভিযোগাদি দেখছিল আর ভাবছিল।

বেলা তিনটে নাগাদ রমাপতি কারখানায় এলো। নীরব জিজ্ঞাসায় মুখ তুলল অমরেশ। অল্প একটু হেসে রমাপতি নিজের টেবিলে গিয়ে বসল।

অমরেশ খানিক অপেক্ষা করে বলল, আজ আবার আসতে গেলি কেন?

এলাম···। ভালই আছে এখন। রমাপতি টেবিলের কাগজ-পত্র হাতের কাছে টেনে নিল।

মানুষটার পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত জানা আছে অমরেশের। খুঁচিয়ে না বার করলে ওটুকু হাসি আর ওই জবাবটুকুই শেষ।

উঠে কারখানার ভিতরে একবার টহল দিয়ে এলো অমরেশ। রমাপতির এতক্ষণে হিসেবপত্রের মধ্যে ডুবে যাবার কথা। কিন্তু

ব্যতিক্রম দেখা গেল। ঠিক যেন মন দিতে পারছে/না। ফাইল পড়ে আছে তেমনি। উসখুস করছে কেমন। কিছু ঐকটা বলবে বলবে করছে। অমরেশ ব্যতিক্রমটা লক্ষ্য করছিল।

রমাপতি বলেই ফেলল শেষে, তোর সঙ্গে একটু অলোচনা করব ভাবছিলাম···।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে এসে অমরেশ ওর টেবিলের সামনে চেয়ার টেনে বসল।

এই মানে, ওর চিকিৎসার কথা। বিব্রত হাসিটুকু আরো বেশি পরিস্ফুট হল রমাপতির মুখে।—বলছিলাম, অন্য চিকিৎসা কিছু করলে হত, এই মন টনের চিকিৎসা কিছু, অনেক রকম তো হচ্ছে আজকাল····।

অমরেশের নীরবতা এবারে একটু তীক্ষ্ণ মনে হল রমাপতির। তাড়াতাড়ি সামলে নিতে গেল।—না না, আমি সে-সব কিছু বলছি না—হয়ত বা ভিতরে ভিতরে একটা কিছু জট পাকিয়ে আছে যা সুতপা নিজেই জানে না···একটা বইয়ে পড়েছিলাম এরকম অনেক কারণে হয় নাকি—।

অমরেশ চেয়েই ছিল। মাথা নেড়ে সায় দিল এবারে। শুধু ব্যবসায় নয়, সব কিছুতে রমাপতির ভারী একটা স্বচ্ছ দৃষ্টি দেখে আসছে। ওর থেকে অমরেশ শিখেওছে অনেক। চিকিৎসা পরিবর্তনের কথাটা সম্প্রতি তার মনেও এসেছিল। বলবে বলবে করেও বলা হয়নি। রমাপতি নিজেই বলল। অমরেশ খুশিই হল। সুতপা, মানে সুতপা বৌদিকে সে ভালবাসে বললেও অত্যুক্তি হবে না। তার প্রাগ-বিবাহ জীবনের জটিলতা যদি কিছু বেরিয়েই পড়ে, ভাবনার কিছু নেই। রমাপতি নীলকণ্ঠ।

রমাপতির বয়েস সম্প্রতি আটত্রিশ পেরিয়েছে। মোটামুটি ভাবে ম্যাট্রিক পাশ করে অদৃষ্টবিপর্যয়ে একদিন তাকে দোকানে দোকানে তেল সাবান স্নো পাউডার ক্যানভাস্ করতে হয়েছে। খুব ছোট দুটি ভাই ছিল আর মা ছিল। মা আর নেই। ভাইয়েরা লেখাপড়া শিখে বাইরে চাকরি করে। সম্প্রতি আস্ত একটা সাবান কারখানার দশ আনার মালিক রমাপতি। বাড়ি করেছে। গাড়িও করতে পারে। করেনি। পাঁচশ টাকার মূলধন নিয়ে ব্যবসা শুরু করার সময় বি-এ পাস পিসতুত ভাই অমরেশ ষাট টাকা মাইনের পাকা চাকরি ছেড়ে রমাপতির সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। ওর মূলধন, উৎসাহ আর উদ্যম। কারখানার বাকি ছ'আনার মালিক সে। বয়সে মাস দুই ছোট রমাপতির থেকে। আত্মীয়তার বাঁধন যতটুকু, তার থেকে অনেক বেশি ওদের ভিতরের বাঁধন।

অথচ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ দুজনে। একেবারে ভিন্ন ধাতুতে গড়া। আর্থিক নিরাপত্তার সঙ্গে সঙ্গে অমরেশ বিয়ে করেছে। ছুটির দিনে বা অবকাশ সময়ে সে যখন নিরুপমাকে নিয়ে থিয়েটার বায়স্কোপে যেত বা হৈ চৈ করে বেড়াতে বেরুতো, রমাপতি যেত দক্ষিনেশ্বর বা তেমনি নিরিবিলি আর কোথাও। অমরেশ যখন স্ত্রীর সঙ্গে বসে গল্প করে, রমাপতি তখন বই পড়ে। পড়াশুনা হয়নি বলে মনে মনে একটু দুর্বলতা ছিল রমাপতির। তাছাড়া একটা শূন্যতার চাপও উপলব্ধি করত থেকে থেকে।

অন্নবস্ত্রের থেকেও গভীর যে প্রয়োজন, মানুষ তাকে খোঁজে নানাভাবে, নানা পথে। রমাপতি খুঁজল বইয়ের মধ্যে। গল্প উপন্যাস নয়, যে বই শুধু নিজেকে প্রবল করে, পরিপূর্ণ করে পাবার

ইঙ্গিত দেয়। যে বই বলে, আপনাকে পাবার জন্যে বেরিয়ে পড়ো, আপনাকে না পেলে আপনার চেয়েও যিনি বড় আপন তাঁকে পাবে কেমন করে?

রমাপতি যখন সেই বৃহৎ আপনাকে পাবার চেষ্টায় নিজেকে অনেকটাই বদলে ফেলেছে, অমরেশের ঘরে ততদিনে তিনটি আগন্তুকের আবির্ভাব ঘটেছে।—কিন্তু তা সত্ত্বেও ভিতরকার বাঁধন ওদের এতটুকু চির খায়নি। বরং আরো বেড়েছে। বিপরীতধর্মী চুম্বকের মতই ওদের আকর্ষণ।

রমাপতির বিয়ের প্রসঙ্গ অমরেশ মাঝে মাঝে তুলত। রমাপতি প্রথম প্রথম একেবারে কান দেয়নি।—কিন্তু শূন্যতার চাপটা যেন একেবারে যাচ্ছে না। ওদিকে যত দিন যায় অমরেশের মনে হয়, লোকটা যেন স্তিমিত হয়ে আসছে কেমন। স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে বেশ জোর দিয়েই বিয়ের প্রসঙ্গটা ঘন ঘন তুলতে লাগল অমরেশ।

শেষে রমাপতি একদিন বলল, এ বয়সে আবার বিয়ে কি রে—

অমরেশ জবাব দেয়, এ বয়সে যে বয়সের মেয়ে বিয়ে করা চলে সেরকম মেয়ের কিছু অভাব আছে নাকি?

রমাপতি আর একদিন বলল, একটু লেখাপড়া জানা-টানা মেয়ে আমাদের ঘরে আসবে কেন?

অমরেশ হেসে ফেলল, আচ্ছা সে ভার তুই আমার ওপর ছেড়ে দে।

তারপর সুতপার সঙ্গে বিয়ে।

অমরেশের শ্বশুর বাড়ির দিক থেকে সম্পর্ক আছে কি একটা। বেসরকারী কলেজের অধ্যাপক সুতপার বাবা। পাঁচ মেয়ে দুই

ছেলে তাঁর। মেয়েরা দেখতে বেশ সুশ্রী। কিন্তু সুশ্রী হলেও দেখেশুনে পাঁচ মেয়েকে ভালো ঘরে-বরে পার করার সংগতি বেসরকারী কলেজের অধ্যাপকদের কমই থাকে। তার ওপর ছেলে আছে দু'টি। প্রথম তিন মেয়েকে পাত্রস্থ করার পর একেবারে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন ভদ্রলোক। চতুর্থ সুতপা বি-এ পাস করে এম-এ পড়ল কিছুদিন। তারপর বলা নেই কওয়া নেই পড়াশুনা ছেড়ে দিলে হঠাৎ। স্বল্পভাষিনী, কিন্তু প্রাণ-প্রাচুর্য কম নয়। একঘেয়ে ঘরে বসে থাকতে ভাল লাগল না। সংসারের অনটনও আছে। মেয়ে ইস্কুলে মাস্টারী যোগাড় করে নিল একটা। বছর দুই কাটল নিশ্চিন্তে। তারপর আবার হঠাৎ একদিন সব ছেড়েছুড়ে বাড়িতেই বসে রইল। ইস্কুল কর্তৃপক্ষ থেকে চিঠি এলো, জনা দুই ভদ্রলোক দেখাও করতে এলেন ওর সঙ্গে বাড়ি বয়ে। কিন্তু দেখা না করে সুতপা ভিতর থেকে বলে পাঠালো, সে আর চাকরি করবে না।

সুতপার মা বাবা অবাক হলেন। কিন্তু এই নিয়ে আর জিজ্ঞাসাবাদ করলেন না কিছু। ভাবলেন, বলার হলে মেয়ে নিজেই বলত।

আরো একবছর কাটলো এমনি বাড়ি বসে। তারপর সেই যোগাযোগ।

ম্যাট্রিক পাস শুনে সুতপার বাবা বেশ দমে গেলেন। কিন্তু অমরেশ যে ভাবে বলল, তাতে যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী অনায়াসেই রমাপতির ওপর চাপানো চলে। তাছাড়া, সত্যিকারের ভালো না হলে নিজেদের মেয়ে নিরুপমারই বা অত আগ্রহ কেন। অন্দরমহলে এবং আড়ালে সুতপার সঙ্গেও

কথাবার্তা নিরুপমা-ই চালালে।

মন স্থির করতে না পেরে ভদ্রলোক নিজেই মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেন। ভেবেছিলেন, ওর মায়ের মারফৎ মতামত জানা যাবে। কিন্তু সুতপা ঘাড় নেড়ে তাঁকেই জানিয়ে দিলে, বিয়ে হতে পারে, তার দিক থেকে আপত্তি কিছু নেই।

বিয়ে হল।

তারপর যত দিন গেল, সুতপার মনে হল, এরা অত্যুক্তি করেনি কেউ। ভাগ্য তার ভালই। এত ভালো বোধ হয় সচরাচর হয় না। একটা ধীর সৌম্য প্রশান্তি যেন মানুষটিকে ঘিরে আছে। সান্নিধ্য মাত্রে শুচিস্পর্শ-বোধ জাগে। আনন্দে হেসে ঠাট্টাও করেছে, সাবানের কারখানার গুণ অনেক।

অমরেশও ছিল সেখানে। বলতে ছাড়েনি, ওঃ, সাবানের কারখানায় যেন আর কেউ কাজ করছে না!

সুতপা তৎক্ষণাৎ জব্দ করেছে ওকে, তা তো করছে, কিন্তু কয়লার গুণ যে আলাদা!

জব্দ হয়ে অমরেশ রমাপতিকেই চোখ রাঙিয়েছে, ছাখ, তোর বউ তোর সামনেই আমাকে কয়লা বলছে, ভালো হবে না কিন্তু!

বেড়ানো-টেড়ানো, হৈ-চৈ করার বাহন অমরেশ। তিনটি ছেলেমেয়ের বাবা কেউ বলবে না। ঝিয়ের হাতে তাদের সমর্পণ করে নিরুপমাকেও হিড় হিড় করে টেনে বার করে একটু ফুরসত পেলেই। রমাপতিকেও টানতে চেষ্টা করেছে প্রথম প্রথম। কিন্তু তার খুব পরিবর্তন নেই। বলে, যার জন্যে এসেছিস, তাকেই নিয়ে যা, আবার আমাকে কেন—।

অমরেশ বড় নিঃশ্বাস ফেলেছে একটা।—নিজের একটা বউ

নিয়েই হিমশিম) খাচ্ছি, আবার তোরটাও শেষ পর্যন্ত আমার কাঁধেই চাপল?

সুতপা হাসে। বলে, শখ দেখে বাঁচিনে—।

নতুন সংসারে কিছুটা অভ্যস্ত হয়ে এবারে মানুষটাকে ভাল করে বুঝতে চেষ্টা করল সুতপা। তার বইটই গুলো নিয়ে নাড়া-চাড়া করতে লাগল। রমাপতি লজ্জা পায় প্রথম প্রথম। সুতপা বলে, চমৎকার জিনিস তো, কিন্তু সব বুঝতে পারিনে—তুমি বলো না, শুনি—।

রমাপতি খুশি হয়ে জবাব দেয়, আমিই কি বুঝতে পারি না কি, পারলে আর দুঃখ ছিল কি।

কিন্তু তবু কথায় কথায় আলোচনা ওঠে এক এক দিন। অন্তর-দর্শনের কথা। উপলব্ধির কথা। মানুষটা তখন যেন বদলে যায়। বদলে যায় সুতপাও। অন্তস্তল থেকে শিহরণ ওঠে একটা। কথাগুলো যেন শব্দ নয়, আলোর স্পর্শ।

এরই মধ্যে দু'একদিন ভগ্নদূতের মত এসে হাজির হয়েছে অমরেশ। দু'চার মিনিট চেষ্টা করেছে চুপচাপ বসে শুনতে। চিৎকার চেঁচামেচি করে উঠেছে তারপর।—জল! বাতাস! দমবন্ধ হয়ে গেল! ইত্যাদি—। শব্দব্রহ্মের বিপরীত খাতে পড়ে মুহূর্তের জন্য হকচকিয়ে যায় ওরা। তারপর হাসাহাসি। খানিকটা জল এনে অতর্কিতে ওর মাথায় চাপড়েই দেয় সুতপা। তারপর ওই জল নিয়ে কাড়াকাড়ির ফলে দুজনকেই ভিজতে হয় অল্প বিস্তর।

দিন যায়, মাস যায়, বছর ঘুরে আসে।

সুতপার পরিবর্তন হতে লাগল একটু একটু করে। এত ধীরে যে প্রথম প্রথম চোখেই পড়ল না কারো। পড়ল যখন তখন

অনেকটা বদলে গেছে। চুপচাপ বসে থাকে। ভাবে কি। ভরা প্রাচুর্যে একটা শুকনো টান ধরে যাচ্ছে যেন। রমাপতি চিন্তিত হয়ে ওঠে। অমরেশকে জিজ্ঞাসা করে, কি রে, কি ব্যাপার?

অমরেশ জবাব দেয়, আমিও তো দেখছি,—জিজ্ঞাসা করে ছাখ্ না?

রমাপতি সে চেষ্টা আগেই করেছে। সুতপা হেসে বলেছে, কি আবার হবে, বেশ তো আছি।

জিজ্ঞাসা অমরেশও করেছে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, সইয়ে রসিয়ে। খানিক চুপ করে থেকে সুতপা হেসেই ফেলেছে একটু। কিন্তু যেমনটি হাসত আগে, ঠিক তেমনটি যেন নয়। পরে বলেছে, ভিতরে গলদ থাকলে, সব ভাগ্য সকলের সয় না —।

ছদ্ম-হতাশায় অমরেশ হাল ছেড়ে দেয় যেন।—তুমিও ভিতর নিয়ে পড়েছ—! ওই মুখ্‌খুটার হাতে পড়ে তোমারও বারোটা বেজে গেছে দেখছি।

সুতপা হাল্কা ঠেস দিয়ে বলে, অমন মুখ্‌খু একটু আধটু হওয়া যায় কিনা চেষ্টা চরিত্র করে একবার দেখই না—

শুনে খুশি হয় অমরেশ।—খুব যে! তা সেটা যখন জানই, গলদটাও সব ওই খানেই উজাড় করে দাও গে যাও না! অমন গঙ্গাজল আর পাবে কোথায়?

শোনামাত্র থতমত খেয়ে সুতপা প্রস্থান করে।

প্রথম প্রথম অন্য রকম ভেবেছিল রমাপতি। নিজের লেখাপড়া না হওয়ার দুর্বলতা একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ভাবল, সেটাই দিনে দিনে বড় হয়ে উঠছে সুতপার চোখে। কিন্তু পরে মনে হল তা নয়, বরং তার দিকেই যেন আরো বেশি করে

ঝুঁকছে ও। তার দিকে আর তার বই পত্রের দিকে। এড়িয়ে চলছে অমরেশকেই।—হাল্কা হাসিঠাট্টা হৈ চৈ থেমে গেছে।

সেটা বিশেষ করে লক্ষ্য করল এক ছুটির দিনে। কি একটা আলোচনার মাঝে অমরেশ এসে জোর তাগিদ দিল, সিনেমার টিকিট কাটা হয়েছে, ঠিক দশ মিনিটের মধ্যে রেডি না হলে যেমন আছ তেমনটি টেনে বার করব—।

সুতপা তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, ও মা, আমরা যে বেলুড় যাচ্ছি একটু বাদে! সেখানে যাবে তো চলো।

খানিক থমকে দাঁড়িয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল অমরেশ। সুতপা হাসতে লাগল। রমাপতি অবাক।—বেলুড় যাবে, কই বলোনি তো কিছু!

—বলব ভাবছিলাম। কাজ নেই তো কিছু, চলো না বেড়িয়ে আসি একটু?

রমাপতি তক্ষুনি প্রস্তুত। গঙ্গার ধারে একটা নিরিবিলি জায়গা বেছে নিয়ে পাশাপাশি বসল দু'জনে। দ্বিধা কাটিয়ে রমাপতি তুলেই ফেলল কথাটা। সুযোগ সব সময় আসে না। বলল, কি হয়েছে তোমার আজকাল ঠিক বুঝি না।

কেন, এখানে এলাম বলে?

না, এখানে আসা তো ভালই। দেখ, সব কিছুর আগে ভিতরটাকে একেবারে শাদা করে নিতে না পারলে সবই পণ্ডশ্রম। যতই বই পড়ি আর যতই আলোচনা করি। ভিতরে ভিতরে কেন কষ্ট পাচ্ছ বলো না খুলে?

রমাপতির মনে হল হঠাৎ যেন একপ্রস্থ আবীর পড়ল ওর মুখে। তারপর ঠিক তেমনিই ফ্যাকাশে হয়ে গেল আস্তে আস্তে।

হাসল একটু। পরে ঠাট্টার সুরেই বলল, তোমার সঙ্গে থেকেও ভিতরটা শাদা না হলে কেমনতরো গুরুমশাই তুমি—?

প্রথম অঘটন ঘটল এর দিনকতক পরেই। বসেছিল চুপচাপ। সমস্ত দেহে হঠাৎ প্রচণ্ড ঝাঁকুনি। তারপর কাঁপুনি। অবিশ্রান্ত। দাঁতে দাঁত লেগে গেল। হকচকিয়ে গিয়ে রমাপতি পুরোদমে পাখা খুলে দিয়ে মাথায় জল দিতে লাগল। কিন্তু কাঁপুনি বাড়ছেই। অমরেশ দৌড়ে এলো। নিরুপমাও।

ডাক্তার বললেন হিস্টিরিয়া। ওষুধ এবং যথাবিধি নির্দেশ দিয়ে গেলেন। বহুক্ষণ বাদে শ্রান্ত অবসন্নের মত দেখা গেল সুতপাকে। কিন্তু থেকে থেকে কেঁপে উঠছে তখনো। অমরেশ একাই কারখানায় চলে গেল। নিরুপমাও নিচে নেমে গেল একসময়। একেবারে কাছে, বুকের কাছে, মুখের কাছে ঝুঁকে এলো রমাপতি। দু'হাত বাড়িয়ে সুতপা আঁকড়ে ধরল তাকে। ওর বুকের মধ্যে আবার কাঁপতে লাগল ঠক্ ঠক্ করে। দু'হাতে রমাপতিও যেন আগলে রাখতে চাইল তাকে। ঘরের দরজা খোলা, খেয়াল নেই।

অনেকক্ষণ বাদে সুতপা সুস্থ হল, শান্ত হল। দুশ্চিন্তা সত্ত্বেও ওর এই একান্ত সমর্পণ রমাপতিরও যেন ভালই লাগছে। আবেশে জড়িয়ে এলো সুতপার দুই চোখ। ঘুমিয়ে পড়ল বোধ হয়।

খোলা দরজার দিকে চেয়ে ধড়মড় করে উঠে বসল যখন, বেলা গড়িয়ে গেছে। লজ্জা পেয়ে বলল, তোমার আজ অফিস যাওয়া হল না তো?

না হোক। কেমন লাগছে এখন?

—ভালো।....হঠাৎ কি রকম হয়ে গেল যেন, তুমি কারখানা

থেকে ঘুরে এসো একবার, আর কিছু ভয় নেই, বেশ হাল্কা লাগছে এখন।

প্রথম সূচনা এই।

মাঝে মাঝেই এ রকম ঘটতে লাগল তারপর। বছর ঘুরে এলো একভাবেই। ডাক্তার আসছে একজন ছেড়ে আর একজন। কাজকর্মে মন দিতে পারে না রমাপতি। কারখানায় যাওয়া বন্ধ করতে হয় প্রায়ই। অসহায় ছোট মেয়ের মতই স্থতপা ওকে আঁকড়ে ধরে থাকে তখন।

অমরেশের কাছে মনের চিন্তা ব্যক্ত না করে পারে না নিরুপমা। নিজেরাই তোড়জোড় করে বিয়ের ব্যাপারটা ঘটিয়েছে, এ জন্যও দায়িত্ববোধ স্বাভাবিক। অনেক কথাই এখন মনে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে তাদের। স্থতপার এম্-এ পড়া ছাড়ার কথা আর তেমনি হঠাৎ তার ইস্কুলের চাকরি ছাড়ার কথা। বাড়িতে লোকজন আনাগোনার প্রসঙ্গ নিয়েও কথা হল। নিরুপমা বলল, কি জানি বাপু বুঝি না, যে চাপা মেয়ে—তখন থেকেই মনের মধ্যে একটা কিছু হয়ে আছে কি না কে জানে—ভালো থাকলেও তো আজকাল নিচের সিঁড়ি মাড়ায় না একবার—সারাক্ষণ ওই ছাই, ভস্ম তত্ত্বকথার বই নিয়ে আছে—নয় তো দাদার (রমাপতির) মুখে সেই কথাই শুনছে। ভেতরের একটা কিছু অশান্তি চাপা দেবার জন্যে না হলে এ রকম হয় ?

এই একই প্রশ্ন বোধ হয় উদয় হয়েছে রমাপতির মনেও। বিয়ের পর প্রথম প্রথম পড়া বা চাকরি ছাড়া নিয়ে তার সামনেই স্থূল ঠাট্টায় অমরেশ স্থতপাকে বিব্রত করতে চেষ্টা করেছে অনেক দিন।

ইদানীং নিবিড় মমতায় রমাপতি অনেক চেষ্টা করেছে ওর

মনের ভিতরটা উন্মুক্ত করে দেখতে। বলেছে, ভিতরে ত' আমাদের পর্দার পর পর্দা, সারি সারি পর্দা—এ পর্দা যত ছাড়াবে ততো আনন্দ—অসঙ্কোচে একবার একে সরাতে পারলে ছুনিয়ার কোনো লজ্জা, কোনো ভয়, কোনো গ্লানি সেই স্থিরবুদ্ধি অসংমূঢ়ের'পরে ছাপ ফেলতে পারে না—ও সব বাইরের জিনিস মাত্র।

সমস্ত আগ্রহ একত্র করে স্নুতপা শোনে।...পরম নির্ভরে। আর ব্যথায় টন টন করে ওঠে রমাপতির বুকটা। যত দূর সম্ভব চেষ্টা করে ওই আত্মদর্শনের আলোচনার স্পর্শেই ওকে শান্ত করতে, সুস্থ সবল করে তুলতে। গোপনে মনস্তত্ত্ব সংক্রান্ত বইপত্রও ঘাঁটছে রমাপতি।

ভেবে চিন্তে এই চিকিৎসারই কোনো বিশেষজ্ঞকে দেখানো সাব্যস্ত করে কথাটা সেদিন অমরেশের কাছে উত্থাপন করল।

বিশেষজ্ঞ এলেন।

বেশ নাম ডাক আছে। প্রৌঢ়। রাশভারী প্রকৃতি। সপ্তাহে চারদিন ছু'ঘণ্টা করে সিটিং দেবার কথা বাড়িতে। রোজ মোটা টাকা গুনতে হবে এই জন্য। সেজন্য ভাবে না কেউ, কিন্তু তাঁর চিকিৎসার গতি পদ্ধতি দেখে খুব একটা আশ্বাস পাচ্ছে না রমাপতি বা অমরেশ। মোটামুটি কেস্ শোনার পর প্রথম দিন অবশ্য স্নুতপাকে পরীক্ষা করেছেন তিনি, ওর সঙ্গে এবং সকলের সঙ্গেই বসে গল্প করেছেন অনেকক্ষণ। দ্বিতীয় দিনের ছু'ঘণ্টা শুধু অমরেশের সঙ্গেই কথা বলে কাটিয়েছেন, স্নুতপাকে একবার তিনি দেখতেও চাননি। তৃতীয় দিন রমাপতির সঙ্গে গল্প ফেঁদে বসেছেন—যেন ওরই জীবন বৃত্তান্ত লিখবেন কিছু।

একদিনের দু'ঘণ্টা কাটলেই মোটা টাকা। কাজেই অমরেশ এবং রমাপতির দু'জনেরই কেমন বিসদৃশ লাগল ব্যাপারটা। এদের অনেক ভড়ংচড়ং আছে শুনেছিল। রোগী নিয়ে বসার আগেই তিন দিন কাটল—সিটিং সুরু হলে ক'দিন বা ক'মাস কাটবে ঠিক কি।

কিন্তু এই তৃতীয় দিনেই একটা অপ্রত্যাশিত আচরণ দেখা গেল মানসিক চিকিৎসা বিশেষজ্ঞটির।

দু'ঘণ্টার অনেক আগেই উঠে সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালেন তিনি। রমাপতিও এলো সঙ্গে সঙ্গে। ওদিকের ঘরে অমরেশ সুতপার সঙ্গে কথা বলছিল, সেও বেরিয়ে এলো। তার কাছেই ফীস্-এর টাকা। বলল, আজ চললেন ?

ডাক্তার দাঁড়িয়ে পড়লেন।....জবাব না দিয়ে তার দিকে তাকালেন শুধু।

অমরেশ আবার জিজ্ঞাসা করল, কাল থেকে ওঁকে নিয়ে বসবেন ?

ওঁকে অর্থাৎ সুতপাকে।

ডাক্তার থমকে ভাবলেন একটু। পরে সাফ জবাব দিলেন, না—। কাল থেকে আর আসব না। আর আসার দরকার হবে না।

তারপরেই রমাপতির দিকে চেয়ে প্রায় রুক্ষ কণ্ঠেই ঝাঁঝিয়ে উঠলেন তিনি, বিয়ের পরেও যদি এভাবেই চলবেন ঠিক করেছেন, তা হলে বিয়ে করার দরকার ছিল কি ? বনে জঙ্গলে বা গুহা-গহ্বরে গিয়ে একটা আশ্রম-টাশ্রম খুলে বসলেই তো পারতেন ?

অমরেশকে বললেন, ওঁর স্ত্রীর কোনো চিকিৎসার দরকার নেই, এঁরই বরং একটু আধটু চিকিৎসা করুন।

গট্‌গট্‌ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে লাগলেন তিনি।

ওরা দু'জনে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে। বিমূঢ়, হতভম্ব।

তারপরই যেন একটা উপলব্ধির আনন্দ উপচে উঠল অমরেশের চোখে। হন্তদন্ত হয়ে সিঁড়ি ধরে নিচে ছুটল সে।

ডাক্তারের ফীস্‌ দেওয়া হয় নি—।

সেলিম চিশ্‌তির কবর

মফঃস্বল শহরের এক পাশ দিয়ে গঙ্গার ধার-ঘেঁষা রাস্তার একটা মাথা এসে থেমেছে মেয়ে-ইস্কুলের সামনে। উঁচু বাঁধানো রাস্তা। নিচে গঙ্গা। একটু দূরে দূরে এক-একটা অতি বৃদ্ধ বট-অশ্বত্থ ডালপালা ছড়িয়ে মাঝে মাঝে গঙ্গাকে আড়াল করেছে।

সকাল ন'টা না বাজতে রাস্তাটার ভোল বদলায়। ছোট ছোট মেয়েদের পায়ের ছোঁয়া পেয়ে এতক্ষণের ঝিমুনিভাব কাটিয়ে যেন সজাগ হয়ে ওঠে। কিশোরী মেয়েদের কল-মুখরতায় লাল গঙ্গা আর লালচে অশ্বত্থ বটের শান্ত উদাসীনতায় বেশ একটা ছেদ পড়ে কিছুক্ষণের জন্য। দলে দলে মেয়েরা যায় বই বুকে করে, বইয়ের ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে, অথবা বই-ভরা ছোট ছোট টিনের বাক্স দোলাতে দোলাতে। রাস্তা জুড়ে চলে তারা। এরই মধ্যে সাইকেল-রিকশর ভেঁপু কানে এলে দু'পাশে সরে আসে। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে দেখে কে যায়।

মাস-ভাড়া সাইকেল-রিকশয় ঠাসাঠাসি হয়ে চলেছেন মীরাদি আর প্রভাদি। সাইকেল-রিকশয় ওটুকু বসার জায়গা ওই দুজনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। বড় মেয়েরা টিপ্পনী কাটে আর হাসে। ছোট মেয়েরা তাদের হাসির কারণ বুঝতে চেষ্টা করে।

একটু বাদে আবার শোনা যায় সাইকেল-রিকশর ভেঁপু। কে আসে? প্রতিভাদি আর শোভাদি। তাদের দুজনের মাঝখানে আবার একটা ছোট মেয়েকে অন্তত বেশ বসিয়ে নিয়ে যাওয়া চলে। রাস্তার মাঝখানে আবার জড়ো হয়ে চলতে চলতে বড় মেয়েরা এক একদিন সেই পুরনো গবেষণায় মেতে ওঠে। উল্টে-পাল্টে ঠিক

করলেই তো পারে সাইকেল-রিকশ—মীরাদির সঙ্গে প্রতিভাদি আর প্রভাদির সঙ্গে শোভাদি। নয়ত, মীরাদি আর শোভাদি, আর প্রভাদি আর প্রতিভাদি। চিরাচরিত সিদ্ধান্তেই এসে থামতে হয় আবার। অর্থাৎ, যার সঙ্গে যার ভাব।

আবার কে আসে ?

ও বাবা ! মালতিদি আর স্মৃতিদি ! হেড মিসট্রেস আর সহকারী হেড মিসট্রেস। সর্, সর্ ! রাস্তার দুপাশ ঘেঁষে চলে মেয়েরা। একটানা ভেঁপু বাজিয়ে সাইকেল-রিকশ তরতরিয়ে চলে যায়।

এদিক থেকেই আসেন মেয়ে-স্কুলের বেশির ভাগ টিচার। শেয়ারে মাস-ভাড়া সাইকেল-রিকশ ঠিক করা আছে। সকালে নিয়ে আসে আর বিকেলে পৌঁছে দেয়।

শুধু একজন ছাড়া। অর্চনা বসু।

তিনি হেঁটে আসেন আর হেঁটে ফেরেন। পৌনে দশটা নাগাদ যে মেয়েরা ইস্কুলের কাছাকাছি এসেছে, নিজেদের অগোচরে মাঝে মাঝে পিছন ফিরে তাকাবে তারা। দেখতে পেলে অস্বস্তি, না পেলে উসখুসুনি। ঠিক সময় ধরে এলে এক জায়গায় না এক জায়গায় হবেই দেখা। হেঁটে আসেন। তবু সামনের মেয়েরা ঘাড় না ফিরিয়েই বুঝতে পারে তিনি আসছেন। কারণ, যেখান দিয়ে আসেন তার আশপাশের প্রাণ-তারুণ্য হঠাৎ যেন থেমে যায় একটু।

কান সচকিত করা ভেঁপু নেই সাইকেল-রিকশর—তবু সরার পালা। পথের মাঝখান থেকে ধারে সরে আসা নয়। ধারের থেকে মাঝখানে বা ওধারে সরে যাওয়া। যিনি আসছেন, গঙ্গার দিকের রাস্তার ধারটা যেন তাঁর খাসদখলে।

ফ্যাকাশে শাদা গায়ের রং, ধপধপে শাদা পোশাক, শাদা চশমা, শাদা ঘড়ির ব্যাণ্ড, পায়ে শাদা জুতো—সব মিলিয়ে এক ধরনের শাদাটে ব্যবধান। মেয়েদের আভরণে যে-শাদা রিক্ত দেখায়, তেমন নয়। যে-শাদা চোখ ধাঁধায়, প্রায় তেমনি।

আজ দু'বছর হল অর্চনা বসু এসেছেন এই ইস্কুলে। দু'বছর ধরে ঠিক এই এক রকমটি দেখে আসছে মেয়েরা। কোন দিকে না চেয়ে রাস্তার ধার ঘেঁষে সোজা হেঁটে আসেন। ঠিক কোন দিকে না চেয়েও নয়। মাঝে মাঝে গঙ্গার পাড়ের দিকে চোখ পড়ে। জলের ধারে ছোট কোনো ছেলেমেয়ে দেখলে থম্‌কে দাঁড়ান। ইস্কুলের মেয়ে কি না দেখেন লক্ষ্য করে। অনেক চঞ্চল মেয়ে স্কুলে আসার পথে খেলার ছলে উঁচু রাস্তা থেকে দৌড়ে গঙ্গার পাড়ে নেমে যেত, জলের ধার ঘেঁষে ছুটোছুটি করতে করতে স্কুলের পথে এগোতো। বেশি দুরন্ত দুই-একটি মেয়ে অনেক সময় জুতো আর বই হাতে করে জলে পা ভিজিয়ে চলতে গিয়ে আছাড় খেয়ে ভিজে ফ্রক আর ভিজে বই-জুতো নিয়ে ইস্কুলে এসে হাজির হত। আজকাল সেটা বন্ধ হয়েছে। হেড মিসট্রেস বা সহকারী হেড মিসট্রেসের তাড়নায় নয়। অর্চনাদির ভয়ে। যাকে একবার নিষেধ করা হয়েছে, তাকে দ্বিতীয় বার নিষেধ করতে হয় না আর। ছোট বড় সব মেয়েই জানে, অর্চনাদির বিষম জলের ভয়। কিন্তু তাঁর চোখে পড়ার ভয়ে জলের দিকেও এখন আর পা বাড়ায় না কেউ।

চোখে পড়লে কি হবে? অর্চনাদি রাগ করবেন না বা কটূক্তিও করবেন না কিছু। শুধু কাছে ডাকবেন। শুধু বলবেন, জলের ধারে গেছলে কেন? খেলার তো এত জায়গা আছে। তোমাদের

দেখাদেখি আরো ছোটরাও যাবে জলের ধারে। আর যেও না।

এটুকুর মুখোমুখি হতেই ঘেমে ওঠে মেয়েরা। অথচ অন্য টিচারদের গঞ্জনাও গায়ে মাখে না তারা। অর্চনাদির বেলায় এটুকুতেই কেন এমন হয়, বুঝে ওঠে না।

মেয়েদের চোখে মহিলাটির এই জল-ভীতির পিছনে অবশ্য ছোটখাটো ঘটনা আছে একটা। ইস্কুলের পিছনেই গঙ্গার বাঁধানো ঘাট। বাইরের অনেকেই চান করে সেখানে। বিশেষ করে আশেপাশের খ'ড়ো ঘরের মেয়ে-পুরুষেরা। দুপুরে টিফিনের সময় ইস্কুলের ছোট মেয়েদের খেলার এবং বড় মেয়েদের বসার জায়গা ওই ঘাট।

ঘাটের দু'পাশের উঁচু-উঁচু ধাপগুলোর ওপর লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠা-নামা করে ছোট মেয়েরা। শীতকালে জল অনেকটা নিচে থাকে। কিন্তু বর্ষায় ঘাটের সিঁড়ির অর্ধেকটা তো ডোবেই, ওই উঁচু ধাপগুলোরও দুদিক ছাপিয়ে জল উঠে আসে। গেল বারের বর্ষায় এক দুপুরে একটি আধ-বয়সি মেয়ে তার ছোট ছেলে নিয়ে ওই ঘাটে চান করছিল। ছেলেটি নতুন সাঁতার শিখেছিল। বর্ষার ভরা গাঙের বিষম স্রোত টেনে নিয়ে গেল তাকে। তার মায়ের বুকভাঙা কান্নায় আর চিৎকারে গোটা ইস্কুলটা যেন ভেঙে পড়েছিল এই ঘাটে। তখন অনেকেই লক্ষ্য করেছিল, ওই শোকার্ত মায়ের দিকে চেয়ে দুই গাল বেয়ে নিঃশব্দে ধারা নেমেছিল আর একজনেরও।

সেদিন আর ক্লাস নিতে পারেন নি অর্চনা বসু।

এর পরে গঙ্গার দিকে চেয়ে হঠাৎ যেন শিউরে উঠেছেন তিনি। বর্ষার লাল জলে শিশুদেহগ্রাসী লালসার বিভীষিকা দেখেছেন।

মেয়েরা দৌড়াদৌড়ি করে, ছুটোছুটি করে ওই ধাপগুলোর ওপর। পা ফসকে বা টাল সামলাতে না পেরে একবার ওপাশে পড়লে—

আতঙ্কে অস্থির হয়ে অর্চনা বসু দৌড়ে গেছেন হেড মিসট্রেসের কাছে। টিফিনে মেয়েদের ঘাটে যাওয়া বন্ধ করতে হবে। বড় মেয়েরা গেলে ছোট মেয়েরাও যাবে—সেটা ভয়ানক ভয়ের কথা।

হেড মিসট্রেস অবাক! বলেন, কিন্তু ওই ছেলেটা তো চান করতে গিয়ে ডুবেছে। মেয়েদের আটকাবো কেন?

ভয়ের কি আছে এবং কেন আটকানো দরকার অর্চনা বুঝিয়ে দেন। তাঁর সেই বোঝানোর আকৃতি দেখে মনে হবে, যেন আর একটি ছোট মেয়েকেই বোঝাচ্ছেন তিনি। হেড মিসট্রেস চুপচাপ তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকেন খানিক। পরে বলেন, আচ্ছা আমি তাদের সাবধান করে দেব।

কিছু বলার জন্যেই বলা। নইলে কিছুই তিনি করবেন না জানা কথা। উদার-মত-পন্থিনী প্রধান শিক্ষয়িত্রী কোনো কল্পিত ভয়ে মেয়েদের স্বাধীনতা খর্ব করতে রাজি নন।

কিন্তু অর্চনা বসুর চোখে এ ভয়টা ভয়ই। কাজেই যা করার নিজেই তিনি করতে বসলেন। একদিন দু'দিনে কাজ হল না, কিন্তু চার পাঁচ দিনের মধ্যে হল। অর্চনা বসু তো মাস্টারী করে বাধা দেননি কোনো মেয়েকে। তাঁর নিষেধের মধ্যে অব্যক্ত অনুনয়ের সুরটুকুও বাধা হয়ে উঠেছিল বড় মেয়েদের কাছে। অবশ্য একবারেই ঘাটের মায়া ছাড়িয়ে উঠতে পারেনি তারা। কিন্তু অর্চনাদির চোখে চোখ পড়তে কেমন যেন লজ্জা পেয়ে গেছে। অনুযোগ ভরা ওই ঠাণ্ডা দু'চোখের অস্বস্তি তারা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ঘাটে আসা ছেড়েছে আর নিচু ক্লাসের ছোট মেয়েদেরও

আগলে রেখেছে। ফলে টিফিনের সময় ঘাট খাঁ-খাঁ করে এখন।

মেয়েরা জেনেছে অর্চনাদির জলের ভয় খুব। কিন্তু সহ-শিক্ষয়িত্রীরা মুখ টিপে হেসেছেন। কানে কানে ফিস-ফিস করেছেন মীরাদি আর প্রভাদি, প্রতিভাদি আর শোভাদি। এই বাৎসল্য-জনিত আতঙ্কের পিছনে অন্য কিছুর আভাস পেয়েছেন তাঁরা। সেই পুরানো কিছুর।

অর্চনা সবে নতুন এসেছেন তখন। তাঁর এই ধপধপে শাদা সাজসজ্জা সত্ত্বেও এমন শাদাটে ব্যবধান গড়ে ওঠেনি তখনও। মেয়েদের সঙ্গে তো নয়ই। বিশেষ করে খুব ছোট মেয়েদের সঙ্গে। ইস্কুলের মধ্যেই খপ করে এক একটা ফুটফুটে ছোট্ট মেয়েকে কোলে কাঁধে তুলে নিতেন। ক্লাসের মধ্যে একটা বাচ্চা মেয়েকে টেনে কোলে বসিয়েই হয়ত ক্লাসের পড়া শুরু করে দিতেন। ছোট বড় দু'পাঁচটা মেয়েকে তো রোজই বাড়ি নিয়ে যেতেন। চকোলেট দিতেন, লজেন্স দিতেন, বিস্কুট দিতেন।

রকম-সকম দেখে অন্যান্য টিচাররাও হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। নীরব কৌতূহলে চেয়ে চেয়ে দেখেছেন তাঁরা। চেহারা-পত্র, চালচলন বা পুওর-ফণ্ডএ মোটা চাঁদা দেওয়ার বহর দেখে তো বড়লোকের মেয়ে বলে মনে হয়। এম. এ. পাস, দেখতে সুশ্রী। শুধু সুশ্রী নয়, বেশ সুন্দর। কিন্তু বয়েস তো তিরিশের ওধারে গড়িয়েছে। বিয়ে হয়নি কেন? তাঁর অন্তরঙ্গ হতেও চেষ্টা করেছিলেন দুই-একজন। কিন্তু ভিতরের কৌতূহলটুকু বড় হয়ে উঠেছিল বলেই হয়ত বন্ধুত্ব জমেনি। উল্টে বিচ্ছিন্নতাই এসেছে এক ধরনের। আড়ালে কানাকানি করেন তাঁরা, হাসাহাসি করেন। মেয়েদের নিয়ে এসব কি কাণ্ড! বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কি।

এই বাড়াবাড়িটাই তাঁদের চোখে চরমে উঠেছিল একদিন। শুনে বিস্ময়ে কৌতুকে প্রায় বিভ্রান্তই হয়ে পড়েছিলেন তাঁরা। তারপর বেদম হেসেছেন। এ ওর গায়ের ওপর পড়ে হেসেছেন।

আসলে এই ব্যাপার!

শিক্ষয়িত্রীদের কাছে ব্যাপারটা অস্বাভাবিক মুখরোচক হয়ে উঠেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু আসল খবরটাই শুধু শুনেছিলেন তাঁরা, সবটা জানেন না। মাঝারি ক্লাসের একটি মেয়ে তার তিন বছরের ছোট ভাইকে নিয়ে অর্চনাদির বাড়ি গিয়েছিল। কাছেই বাড়ি, গেলে অর্চনাদি খুশি হন জানে। আরো খুশি হন ছোটদের নিয়ে গেলে, তাও জানে। অর্চনা খুশি হয়েছিলেন। ছু হাত বাড়িয়ে কোলে টেনে নিয়েছিলেন ছেলেটাকে। ঢলঢলে শিশু এভাবে আক্রান্ত হয়ে ড্যাবড্যাবে চোখ মেলে চেয়ে ছিল তাঁর দিকে। তাই দেখে খুশি ধরে না। তাঁর আদরের ঠেলা সামলে ছেলেটা গম্ভীর মুখে প্রায় যেন কৈফিয়তই তলব করেছিল, তুমি কে?

তার দিদি বলে দিতে যাচ্ছিল কে। অর্চনা তাড়াতাড়ি বাধা দিয়েছেন। পরে ছেলেটাকেই আর এক প্রস্থ আদর করে ফিরে জিজ্ঞাসা করেছেন, বল্ তো আমি কে?

ছেলেটা বলতে পারেনি। কিন্তু আদরটা ভালো লেগেছে তার। জবাব দিয়েছে, তুমি দুটু।

ছেলের দিদি হাঁ হয়ে তাদের অর্চনাদিকেই দেখছিল। এমন যেন আর দেখেনি। কিন্তু তারপর কানে যা শুনল, এগারো বারো বছরের মেয়ের তাতে বিস্ফারিত হয়ে ওঠারই, কথা। অর্চনাদি তার ভাইকে ঝাঁকিয়ে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন। বলছেন, আমি মা। বল্ দেখি মা?

শিশুটি বলতে চায় না। বলবে কি করে। তার যে বাড়িতে আর একটা মা আছে। কিন্তু যার হাতে পড়েছে, নিষ্কৃতি নেই বুঝেই শেষে তাকে বলতে হল, তুমি মা।

হ্যাঁ, অর্চনা বসু সেই এক মুহূর্তের জন্য সমস্ত দুনিয়াটাকেই বিস্মৃত হয়েছিলেন বোধ করি। তারপর হুঁশ ফিরেছিল। সচকিত হয়ে উঠেছিলেন তিনি। মেয়েটা ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে আছে তাঁর দিকে। প্রায় ভয় পেয়ে গেছে যেন। সচকিত হয়ে শিশুকে ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন অর্চনা। শুধু চকোলেট লজেন্স বিস্কুট নয়, রসগোল্লা সন্দেশ আনালেন। দু' গাল ভরে সব চিবিয়ে খুশি-মনে ভাইকে নিয়ে বাড়ি চলে গেল মেয়ে। তারপর মাকে বলল অর্চনাদির কাণ্ড। ভাইকে মা ডাকতে বলেছিল, সেই কাণ্ড।

মেয়েকে জিজ্ঞাসাবাদ করে মা কতটা জানলেন, তা তিনিই জানেন। তারপর প্রথমে আচ্ছা করে ধমকালেন মেয়েকে। মফঃস্বল শহর, মহিলা সমিতির কল্যাণে অনেক শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গেই আলাপ-পরিচয় আছে। অর্চনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা না থাকুক, দেখেছেন অনেক। সমবয়সী একজন শিক্ষয়িত্রীর কাছে সেই রাতেই মা চুপি চুপি ব্যাপারটা বললেন। বললেন, কেমনধারা টিচার ভাই আপনাদের—বিয়ে-থা' করলেই তো পারে।

শিক্ষয়িত্রী কোন রকমে সে রাতটা কাটিয়ে পরদিন ইস্কুলে গোপনে আর দুই-একজনের কানে তুললেন কথাটা। এমনি গোপনে গোপনে ব্যাপারটা শুনলেন সহকারী হেড মিসট্রেস এবং হেড মিসট্রেসও। অর্চনা বসু তার পরদিন ইস্কুলে এসেই সহকর্মিনী-দের প্রচ্ছন্ন উত্তেজনাটুকু উপলব্ধি করেছেন। তাঁদের মুখ টিপে হাসা এবং আড়ে আড়ে চাউনিও দেখেছেন। শেষে হেড মিসট্রেস

তাঁকে ঘরে ডেকে যখন বেশ সাদাসিদে ভাবে বললেন, মেয়েদের বড় বেশি প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে, অতটা করা ঠিক ভালো নয়—অর্চনা বসুর বুঝতে বাকি রইল না গত দিনের ব্যাপার কতটা গড়িয়েছে। ক্লাসে সেই মেয়েটির দিকে চোখ পড়তে আরো স্পষ্ট হয়ে গেল সব।

মনে মনে অর্চনা বসু নিজের মৃত্যু কামনা করে কাটালেন ক'টা দিন।

কাজেই, একটা অজানা অচেনা ছেলে জলে ডুবে মরার দরুন অর্চনা বসু অমন উতলা হয়ে উঠেছিলেন কোন্ অনুভূতির ত্রাসে, সেটা মেয়েরা না বুঝুক, শিক্ষয়িত্রীরা বুঝেছিলেন। বুঝে হেসে-ছিলেন, কিন্তু অবাকও হয়েছিলেন।

বাড়িতে সেই ঘটনার পর থেকেই অর্চনা নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলেন সম্পূর্ণ। আর কোনো মেয়েকে বাড়িতে ডাকেন নি, আর কাউকে কোলেও তোলেন নি। গঙ্গার ঘাটের দুর্ঘটনার পর কয়েকটা দিন মাত্র সকলে অস্থির হতে দেখেছিলেন তাঁকে। তারপর আবার যেইকে সেই। যেমন স্থির, তেমনি শান্ত। ওরকম শান্ত বলেই যেন সাজ-সজ্জার শুভ্রতা আরো বেশি করে চোখে পড়ে। আরো দূরে ঠেলে দেয় সকলকে। শুধু মেয়েরা নয়, কাছাকাছি হলে শিক্ষয়িত্রীরাও অস্বস্তি অনুভব করেন কেমন।

অর্চনা বসু ইস্কুলে আসেন, পড়ান, বাড়ি যান।

বাড়িতে একটা বুড়ী ঝি আছে শুধু। সব ভার তার হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। মন বুঝে যখন তখন চা করে খাওয়ায় বলেই খুব খুশি তার ওপর। বাড়ি ফিরে হাত-মুখ ধুয়ে চা খেতে খেতে মেয়েদের খাতা দেখতে বসে যান। রাত্রিতে বই পড়েন, নয়ত

ছোট বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে বাইরের দিকে চেয়ে থাকেন চুপচাপ। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারেন না। ধড়ফড়িয়ে উঠে পড়েন। বুড়ীর রান্না দেখেন, বয়েস কালে তার রান্নার হাতযশ কেমন ছিল সাগ্রহে শোনেন। নয়ত, বই নিয়ে বসেন আবার।

রাতে খাওয়ার পরেই আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়েন। চোখে ভাত-ঘুম আসে, কিন্তু এক একদিন আসে না। আসবে না বুঝলেই তাড়াতাড়ি উঠে ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়েন আবার। শিশি-ভরতি ঘুমের বড়ি মজুত থাকে বারো মাস। ঘুম আসে। কিন্তু এক একদিন তাও আসে না। বিবরাশ্রয়ীরা নড়ে চড়ে সজাগ হয়ে উঠতে চায় তখন, স্মৃতিপথে ভিড় করে আসতে চায় চোখের সামনে। প্রথম খানিকটা যোঝাযুঝি করে ঘুমুতে চেষ্টা করেন। কিন্তু নিজেও জানেন সে চেষ্টা পণ্ডশ্রম। তারা আসছে, তারা আসবে। এবারে হারিয়ে যাবার পালা। রাতের অন্ধকারে দু'চোখ টান করে ওরই মধ্যে এক নারীর বোবা আকৃতি দেখার পালা। তার সঙ্গে এক হয়ে যাবার পালা—ওরই ভিতরে রাজ্যের আশা নিয়ে বসে আছে যে নারী, তার সঙ্গে। তিলে তিলে পুড়ে ছাই হচ্ছে সব আশা, কিন্তু তবু আশার শেষ নেই।

শেষ হবে কেমন করে? সেই জ্যোতির্ময়ের আশীর্বাদ মিথ্যে হবে কেমন করে? সে আশীর্বাদের অমৃত-ধারা যে সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করে এসেছিলেন অর্চনা বসু! অন্তস্তলে কার যেন পদধ্বনি শুনেছিলেন মুহূর্তের জন্য। একটা সম্ভাবনার ধুক-ধুক স্পন্দন নিজের বুকের স্পন্দনের সঙ্গে এক হয়ে মিলেছিল। সেই সম্ভাবনার সম্পদ আঁকড়ে বসে আছেন সেদিনের সেই অর্চনা বসু।

আজকের মেয়ে-ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রী অর্চনা বসু জানেন কোনো

কালে সত্যি হবার নয় তা। বার বার নিজেকে বোঝান, ভ্রূকুটি করেন, চোখ রাঙান—। শেষে হাল ছাড়েন। স্মৃতিপথে যারা আসছে, আসবেই তারা। খরখরে দু'চোখ মেলে অর্চনা বসু দেখতে বসেন তাদের।

—কি কাণ্ডই না হয়েছিল সেদিন! বাড়িতে যেন সাড়া পড়ে গিয়েছিল একটা। ভাইদের উত্তেজনা, ছোট বোনের উত্তেজনা, মায়ের উত্তেজনা, আর সব দেখে অর্চনার নিজেরও। দাদা তো পারলে তক্ষুনি আর একটা বিয়ে দিয়ে দেন। হাতের কাছে তেমন পাত্র কি মজুত নেই নাকি ?

আছে সকলেই জানে। এমন একটা দিনে তিনিও এসেছেন বইকি। ঘরের এক কোণে চুপচাপ বসে আছেন, আড়ে আড়ে তাকাচ্ছেন অর্চনার দিকে। তাঁর ফর্সা মুখ একটু বেশি লালচে দেখাচ্ছে আজ। ননিমাধব, দাদার ব্যবসায়ের পার্টনার—ছোট বোন বরুণা আড়ালে যাঁকে মুখ ভেঙচাতো ননির পুতুল বলে।

মাত্র দু'ঘণ্টা আগেও অর্চনা বসু ছিলেন অর্চনা মিত্র। মিত্রকে বরাবরকার মত জীবন থেকে ছেঁটে ফেলে আবার বসু হয়েছেন। কোর্টে রায় বেরিয়েছে। এ রায় বেরুবে সকলেই জানতো। কারণ, দু'পক্ষেরই সমর্থনে এই বিচ্ছেদ, কোথাও কোনো ঝামেলা নেই। তবু ঘোষণাটা পাকাপাকি হওয়া মাত্র বাড়িতে যেন সাড়া পড়ে গেল একটা। শুধু বাড়িতে কেন, শুভার্থী আত্মীয় পরিজনেরাও এলেন। আজকালকার দিনে এটা যে এমন কিছু ব্যাপার নয়, বার বার সে কথাই বলে গেলেন তাঁরা।

বাড়ির মধ্যে বাবাই শুধু চুপচাপ। তাঁর সমর্থন ছিল না অর্চনা জানতেন। সবাই জানতেন। কিন্তু তাঁকে আমল দিচ্ছে

কে! হুট করে মেয়ের এরকম একটা বিয়ে দিয়ে বসেছিলেন বলেই তো এরকমটা ঘটল। মায়ের অমত ছিল, দাদারও আপত্তি ছিল। কিন্তু ভদ্রলোক তাঁর সঞ্চয়ের তবিল জানতেন বলেই কারো কথায় কান দেন নি। স্ত্রীকে আশ্বাস দিয়েছেন, কলেজের প্রোফেসার, বিদ্বান ছেলে, মেয়ে ভালো থাকবে দেখো। স্ত্রী ঝাঁঝিয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু মাইনে যে মাত্র চারশ টাকা!

তিনি জবাব দিয়েছেন, চারশ টাকাই বা ক'জন পায়? তা'ছাড়া কালে আরও বাড়বে।

দু'হাজার টাকায় যাদের মাস চলে না, চারশ টাকায় কেমন করে চলবে, স্ত্রী তাই নিয়ে অনেক তর্ক করেছেন। বলেছেন, মেয়ে তাঁর কুৎসিত নয় যে সাত তাড়াতাড়ি এরকম একটা বিয়ে দিয়ে দিতে হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাধাও দেন নি। তেমন পাত্র আনতে হলে টাকা কত লাগে নিজের ভাইয়ের মেয়েদের বিয়েয় সেটা দেখেছেন।

অর্চনা এম. এ পড়তেন তখন। মেয়েদের ধরন-ধারণ মায়ের মত হলেও বয়সোচিত উদারতা ছিলই খানিকটা। অদেখা কলেজ-মাস্টারটির প্রতি খানিকটা যেন করুণা বশেই বিয়েতে আপত্তি করলেন না অর্চনা। বিয়ে হয়ে গেল।

কিন্তু ক'টা দিন না যেতেই উপলব্ধি করতে লাগলেন, মানুষটি করুণার পাত্র নন খুব। ছেলেবেলা থেকে সংসারে মায়ের প্রভাবটাই বড় দেখে এসেছেন। নিজের সংসারে সেটা বাতিল করে চলার পাত্রী নন অর্চনাও। চারশ টাকা মাইনের কলেজের মাস্টারের নিজস্ব সত্তার জোরটাকেই যেন বরদাস্ত করতে পারলেন না অর্চনা। প্রায় স্পর্ধার মত লাগত। অসন্তোষ প্রকাশ পেতে

লাগল। সুখেন্দু মিত্র—কি নামের ছিরি! কার মাথা থেকে এলো এমন নাম! নাকের নিচে এক পোঁচ কালির মত ও কি! আজকাল ওসব ছাই-ভস্ম রাখে কোনো ভদ্রলোক—কি টেস্ট! পরিষ্কার করে কামিয়ে ফেলতে পারো না? প্যাণ্ট-কোট পরে কলেজ না করতে পারো না-ই করলে, তাই বলে এরকম ধুতি আর এরকম পাঞ্জাবী!

সুখেন্দু মিত্র প্রথম প্রথম চেষ্টা করেছেন সামঞ্জস্য বজায় রাখতে। স্বল্পভাষী, গম্ভীর মানুষ। তর্কের ব্যাপার উপস্থিত হলেই বই নিয়ে বসতেন। কিন্তু কিছুকাল না যেতে এসব ছোটখাট ব্যাপার ছাড়িয়ে একটা বড় রকমের ঘা খেলেন তিনি। সুন্দরী এবং বিদুষী স্ত্রী লাভের মোহ তাঁর ছিল না এমন নয়। এক রাতের উষ্ণ প্রগল্‌ভ মুহূর্তে অর্চনা ছন্দপতন ঘটালেন। পরিষ্কার জানালেন, এই আয়ে সংসারে নতুন ঝামেলা যেন না বাড়ে—বিয়ে হয়েছে বলেই সেরকম দায়িত্বজ্ঞানহীনতা উনি বরদাস্ত করবেন না।

সুখেন্দু মিত্র নিজেকে গুটিয়ে নিতে লাগলেন আস্তে আস্তে। অর্চনা মিটিং করেন, ক্লাবের শৌখিন থিয়েটারে নামেন, মায়ের সঙ্গে পার্টিতে যান। তাঁর খাতিরে সর্বত্রই নেমন্তন্ন থাকে সুখেন্দু বাবুরও। কিন্তু তাঁকে আর দেখেন না কেউ। অর্চনার কৈফিয়ৎ দিতে হয় বলেই বাড়ি এসে কৈফিয়ৎ নিতে ছাড়েন না। সুখেন্দু বাবু বই নামিয়ে অভিযোগ শোনেন। শুনে আবার বই তুলে নেন। এমন কি বাপের বাড়ির কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানেও তাঁর দর্শন পান না কেউ। পাঁচ কথা ওঠে। রাগে জ্বলতে জ্বলতে বাড়ি আসেন অর্চনা। ইচ্ছে করে বইয়ের রাশি ভস্ম করে ফেলতে। মাস্টার জাতটার ওপরেই ক্ষেপে ওঠেন তিনি। চেঁচামেচি করে ওঠেন

কখনো। কখনো বা গুম হয়ে থাকেন। কিন্তু মনে মনে উপলব্ধি করেন, ঝগড়া-ঝাঁটি না করলেও মানুষটার গোঁয়ার ধরনের নিজস্বতা আছে একটা। ওই চুপচাপ বই পড়ার মধ্যে একটা অবজ্ঞা-মিশ্রিত হুল ফোটানোর স্পর্ধা দেখেন অর্চনা।

এমনি করে বছর না ঘুরতে বাপের বাড়ির সবাই, বিশেষ করে অর্চনার মা জানলেন, মেয়েটার জীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে। এই জানাটাকে তিনি চেপে না রেখে বরং বড় করে তুললেন সকলের চোখে। মায়ের ক্ষোভে মেয়ের ক্ষোভ পুষ্ট হতে লাগল আরো। ওদিকে ওপরওয়ালার কারসাজি এমনি যে, অর্চনার বিয়ের পর থেকেই দাদার ব্যবসা যেন ফেঁপে উঠতে লাগল। ধুলো-মুঠি ধরলে সোনা হওয়ার দাখিল। ছোট বোন বরুণার জন্য এখন পাত্র দেখা হচ্ছে এমন জায়গায় যেখানে টাকার ওজনে মনের মত ছেলে কেনা যায়। কাজেই মায়ের উদ্দেশে এখন দাদার উদার অনুযোগও কানে আসে অর্চনার, সাত তাড়াতাড়ি কেন যে তোমরা মেয়েটার এমন একটা বিয়ে দিতে গেলে—দু'দিন সবুর করলে চলত না!

রুদ্ধ আক্রোশে মাসের বেশির ভাগ দিনই বাপের বাড়ি থাকেন অর্চনা। সত্যি কথা বলতে কি, টাকার অভাবটা তাঁর কাছে খুব বড় নয়। রাগ যত ওই মানুষটার ওপর। তাঁকে বশে আনতে পারছেন না বলে। কোনো সাধ্য যে নেই সেটা স্বীকার করে মাথা নুয়ে থাকেন না বলে।

এ অবস্থায় খুব তুচ্ছ একটা কারণ নিয়ে মর্মান্তিক ব্যাপার ঘটে গেল একদিন। ঘটা করে দাদার জন্মদিন হচ্ছে। বৌদি নিজে এসে নেমন্তন্ন করে গেছেন। সুখেন্দু মিত্র যাবেন না, এমন আভাস একবারও দেননি। বরং যাবেন বলেই মনে হয়েছিল অর্চনার।

রাত্রিতে উৎসব-বাড়ি থেকে ফিরে এসে তাঁর হাত থেকে বই টেনে ফেলে দিয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠলেন অর্চনা, আমি জানতে চাই এর অর্থ কী ?

উঠে আগে বই কুড়িয়ে আনলেন স্থখেন্দু বাবু। বসলেন আবার। চোখে চোখ রাখলেন। বললেন, কিসের অর্থ ?

আমাকে এভাবে অপমান করার অর্থ কী ?

একটু থেমে স্থখেন্দু বাবু জবাব দিলেন, তোমাদের বাড়ি গেলে তোমার মা এমন ভাব দেখান আর এমন উপদেশ দেন যাতে আমিও খানিকটা অপমান বোধ করি।

রাগে জ্বলছেন অর্চনা। অনেক টিকা-টিপ্পনী সহ্য করতে হয়েছে আজ তাঁকে। বললেন, আমার মা উপদেশ দেবে না তো উপদেশ দেবে বাইরের লোক এসে ?

উপদেশ হলে কিছু বলতাম না, তিনি অপমান করেন। তা ছাড়া, তোমার ক্লাব থিয়েটার দাদার জন্মদিন—এসবে আমি ঠিক খাপ খাইনে।

অর্চনা ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, খাপ খাও না সে সবাই জানে, কিন্তু মানিয়ে চলতে চেষ্টা করেছ কখনো ? নিজের নেই বলে যাদের আছে হিংসেয় তাঁদের কাছেও ঘেঁষতে চাও না, কেমন ?

স্থির নেত্রে খানিক চেয়ে থেকে স্থখেন্দু বাবু বললেন, হিংসে করার মত তোমাদের কিছু নেই, সেটা বুঝলে এ কথা বলতে না। আমার মানিয়ে চলার থেকেও তুমি আমার মত একজনের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারবে কি না, সে কথাটাই তোমার আর তোমার বাবা-মায়ের আগে ভাবা উচিত ছিল।

এর পরে, অনেক দিন পরে, আর একবার একটি দিন মাত্র

অর্চনা শেষ বোঝাপড়া করার জন্য তাঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন। সোজাসুজি বলেছিলেন, বই নামাও, কথা আছে।

সুখেন্দু বাবু বই নামিয়েছেন।

অর্চনা বললেন, বিয়ের পর থেকে আমাদের বনিবনা হল না, সেটা বোধ হয় আর বলে দিতে হবে না?

সুখেন্দু বাবু বললেন, সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

তা হলে চিরকাল এভাবে চলতে পারে না বোধ হয়?

সুখেন্দু বাবু জবাব দিলেন না।

আমাদের তা হলে ছাড়াছাড়ি হওয়াই ভালো, কেমন?

কি করে?

অর্চনা শান্ত মুখে বললেন, আইনে যেমন করে হয়।

হাতের বই টেবিলে রাখলেন সুখেন্দু বাবু। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ঘরে পায়চারি করলেন একবার। আবার বসলেন। ভাবলেন অনেকক্ষণ। অর্চনা জবাবের প্রতীক্ষা করছেন।

সুখেন্দু বাবু বললেন, যদি তাই চাও, আমার দিক থেকে কোনো বাধা আসবে না।

দু'পক্ষের অনুমোদনের ফলে যা ঘটবার সহজেই ঘটে গেল তারপর। বিচ্ছেদের পরোয়ানা বেরুল।

বাপের বাড়ির আবহাওয়া রীতিমত গরম সেদিন। দাদা ঘোষণা করলেন, শীগগিরই এবার এমন বিয়ে দেবেন অর্চনার যাতে গায়ে আর আঁচটি না লাগে সারা জীবন। মা থেকে থেকে জ্বলে উঠতে লাগলেন সেই অমানুষ লোকটার বিরুদ্ধে, যে একটা দিন শান্তিতে থাকতে দেয়নি তাঁর মেয়েকে—এবারে হাড় জুড়োবে। অর্চনার ছোট বোন বরুণার উত্তেজনা সব থেকে

বেশি। তার দিদিকে হেনস্থা করেছে যে লোকটা, তার কত বড় শিক্ষা হল সেটা ভেবে ডগমগিয়ে উঠছে থেকে থেকে। মাস ছয়েক আগে বরুণার বিয়ে হয়েছে, অদূরে বসে তার স্বামী বেচারি যে ওর আনন্দমিশ্রিত উত্তেজনাটুকু করুণ নেত্রে লক্ষ্য করছে, সেদিকে খেয়াল নেই।

আর, ঘরের আর এক কোণে বসে ফর্সা মুখ রুমালে ঘষে প্রায় লাল করে তুলেছেন ননিমাধব।

দিন কাটতে লাগল। অর্চনা এম, এ পড়তে সুরু করলেন আবার। একটা বছর মাত্র বাকি ছিল। পাস করলেন। পাস করেই আবার নতুন কোনো বিষয় নিয়ে পড়াশুনার তোড়জোড় করতে লাগলেন। কারণ, কিছু একটা নিয়ে থাকতে হবে। জীবন থেকে একজনকে ধুয়ে মুছে ফেলেছেন বটে, কিন্তু এ বিচ্ছেদে ভিতরের ক্ষোভ এতটুকু কমেনি। মর্মান্তিক কিছু একটা ঘটলে যেন খুশি হন। কিন্তু কিছুই ঘটল না। দিন যেমন চলছিল, চলতে লাগল। অর্চনার মনে হত, কি করছে সেই মানুষটা, মনে মনে কেমন জ্বলছে, জানতে পেলে হত। জানার উপায় নেই বলেই নিজে জ্বলতেন। তারপর ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসতে লাগলেন কেমন। পার্টি ভালো লাগে না, ক্লাব না, থিয়েটার না। বই পড়েন। কিন্তু বইও ভালো লাগে না সব সময়। তাঁর এই পরিবর্তনটা চোখে পড়ল সকলেরই। বিশেষ করে মায়ের। নতুন বৈচিত্র্যের সন্ধানে মাঝে মাঝে কিছু একটা প্রোগ্রাম করে মেয়ের মত নিতে আসেন তিনি। অর্চনা কখনো অকারণে ঝাঁঝিয়ে ওঠেন, কখনো বা নিস্পৃহভাবে চুপ করে থাকেন।

ওদিকে দাদার পার্টনার ননিমাধবের কদর বেড়েছে বাড়িতে।

দিন দিন ফুলে ফেঁপে উঠছে ব্যবসা। সেই সঙ্গে ননিমাধবেরও গুণগান বাড়ছে। যে মা কোনোদিন আমল দেন্‌নি তাঁকে, সেই মা আজকাল রীতিমত খাতির করছেন তাঁকে। এলেই চা করে দেন, ভালো-মন্দ খবর নেন, কারণে অকারণে অর্চনাকে ঘরে ডাকেন। যে বরুণা ভদ্রলোককে দেখলেই মুখ ভেঙচাতো ননির পুতুল বলে, আর দিদির কাছে ঠাট্টা করত সীতার লক্ষ্মীমন্ত হনুমান বলে, সেও আজকাল ঠাট্টা তো করেই না, বরং কিছু একটা প্রত্যাশা নিয়ে ভদ্রলোককে লক্ষ্য করে। পারলে একটু যেন তোয়াজ করেও চলে। আর দাদা বৌদির তো কথাই নেই। ননিমাধবের মত এমন লোক তাঁরা একজনের বেশি দু'জন দেখেছেন বলে মনে হয় না।

দাদা বা মায়ের একটা বিশেষ ধরনের ডাক শুনলেই অর্চনা বুঝতে পারেন, ঘরে আর কেউ আছেন। এবং তিনি ননিমাধব ছাড়া আর কেউ নন। অর্চনার মনে যাই থাক বাইরে কিছু প্রকাশ পায় না। ডাকলে সাড়া দেন, ঘরে আসেন, কথা বলেন। আর, রুমালে করে বার বার মুখ মুছতে মুছতে একখানা ফর্সা মুখ লাল হয়ে উঠছে, তাও লক্ষ্য করেন।

অর্চনা আর বিয়ে করবেন না এমন কথা কখনো বলেন নি, বা এমন মনোভাবও কখনো প্রকাশ করেন নি। সেই বিবাহ-বিচ্ছেদের দিন থেকেই তাঁর আবার বিয়ের কথা উঠেছিল। বরং সেই ক্ষোভের মাথায় কাউকে এনে ধরে দিলে হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মত হয়ত বা বিয়ে করেই ফেলতেন অর্চনা। কিন্তু সামাজিক চক্ষুলজ্জার খাতিরেই সম্ভবত প্রথম বছরাবধি সরাসরি এ প্রস্তাব তোলেন নি কেউ। তারপর তাঁর ভাবগতিক দেখে সামনাসামনি কথাটা তুলতে কেউ ভরসা পেয়ে ওঠেন নি খুব। যেটুকু বলেন,

আভাসে ইঙ্গিতে। অর্চনা তার জবাবও দেন না।

কিন্তু যত দিন যায়, তাঁর বিয়ের কথা ভেবে তত অস্থির হয়ে পড়তে লাগলেন সবাই। ওদিকে ননিমাধবের হাজিরা দেওয়াটা প্রায় নৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়াল। মায়েরই গরজ বালাই। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিবাহ-প্রসঙ্গটা তিনিই প্রথম উত্থাপন করলেন মেয়ের কাছে। করে ধমক খেলেন। তারপর মায়ের তাড়নায় ভয়ে ভয়ে হাল ধরতে এলো বরুণা। এসে সেও ধমক খেল। সবশেষে বৌদি। রঙ্গরস করে তিনি অগ্রসর হলেন, বলি ব্যাপারখানা কি? রোজ রোজ ভদ্রলোক এসে মুখ শুকিয়ে বসে থাকেন, দেখে মায়াও হয় না একটু?

অর্চনা খানিক চেয়ে থাকেন তাঁর দিকে।—কি করতে বলো?

কি আবার বলব, বিয়েটা করলেই তো চুকে যায়।

অর্চনা তেতে ওঠেন ভিতরে ভিতরে। শান্তমুখে জবাব দেন, বিয়ে করব কোনদিন তোমাদের বলেছি? তা ছাড়া, করলেও একজন পুরুষমানুষকেই তো বিয়ে করব, না কি?

তাজ্জব বনে হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকেন ভ্রাতৃবধূ। তারপর সরে পড়েন।

আরো একটা বছর ঘুরে এলো। মুখে কেউ কিছু না বললেও অর্চনা কেমন করে যেন বুঝতে পারেন, ননিমাধবের সঙ্গে তাঁর বিয়েটা সম্পন্ন করার পিছনে আগ্রহ তাঁর দাদারই সব থেকে বেশি। শুধু বন্ধু নয়, এতবড় এক উঠতি ব্যবসায়ের অর্ধেক অংশীদার। তাঁকে আত্মীয়তার মধ্যে এনে ফেলতে পারলে ষোল আনা নিশ্চিন্ত।

দাদা বৌদি এবং বরুণার মধ্যে গোপনে গোপনে কি পরামর্শ হল ক'টা দিন। অর্চনা হঠাৎ শুনলেন, বেশ কিছুদিনের জন্য

বেড়াতে বেরুবেন সকলে। দাদা জানালেন, বিশেষ করে অর্চনার জন্যেই কিছুদিন চেঞ্জে ঘুরে আসা দরকার, দিনকে দিন শরীর খারাপ হয়ে পড়ছে। আর, একঘেয়ে ব্যবসায়ের ঝামেলায় ক্লান্ত নাকি নিজেরাও। নিজেরা বলতে আর কে, না বললেও অর্চনা বুঝে নিলেন। দাদার মুখের ওপর আপত্তি করতে পারলেন না। এমনিতেও বাদ প্রতিবাদ আজকাল কারো সঙ্গেই করেন না বড়ো।

সদলবলে বেরিয়ে পড়া হল একদিন। দাদা বৌদি অর্চনা বরুণা আর ননিমাধব। দিল্লীতে দিন কতক থেকে যাওয়া হবে আগ্রায়। আগ্রায় আবার দিনকতক থাকা, তারপর প্রত্যাবর্তন।

কাছাকাছি থাকার দরুন এবারে কিছুটা যেন সহজ হলেন ননিমাধব। তাঁর রুমালে করে মুখ মোছা কমতে লাগল। এর মধ্যে তিন জনই তাঁর দলে, সেটা অনেকদিনই জানেন। সুযোগ সুবিধে মত অর্চনার সঙ্গে কথাবার্তা বলার অবকাশ তাঁরাই করে দেন। অর্চনাও সদয় ব্যবহারই করেন তাঁর সঙ্গে। হেসে কথা বলেন। অর্চনা ইতিহাসের ছাত্রী। ইতিহাস-স্মৃতি বা ইতিহাস নিদর্শনের প্রতি ননিমাধবের সশ্রদ্ধ জিজ্ঞাসাবাদের উত্তরে হেসেই জবাব দেন, যা জানেন। অন্য তিন জনের শোনার থেকেও দেখার দিকেই ঝোঁক বেশি। কাজেই দেখতে দেখতে এদিকে সেদিকে ছড়িয়ে পড়বেন তাঁরা সে আর বিচিত্র কি।

দিল্লী-পর্ব সেরে আগ্রায় আসার মধ্যেই ননিমাধব অনেকটা ভরসা পেয়েছেন মনে মনে। তাঁর থেকেও বেশি ভরসা পেয়েছেন দাদা বৌদি বরুণা। আগ্রায় এসে ইতিহাসের আশ্রয় ছাড়াও অন্য দু'চারটে কথা বলতে সুরু করেছেন ননিমাধব। যেমন, বেড়াতে কেমন লাগছে, আজকাল কথা এত কম বলে কেন অর্চনা, ইত্যাদি।

তাতেও বিরূপ হতে দেখা যায়নি অর্চনাকে। চতুর্থবার তাজমহল দেখতে দেখতে ননিমাধবের কথা শুনে তো বেশ জোরেই হেসে ফেলেছিলেন। ননিমাধব একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, তাজমহল যে প্রেমের স্মৃতি-সমাধি, এখানে আসার আগে এমন করে কখনো মনে হয়নি—শাজাহানের দীর্ঘ নিঃশ্বাসগুলোই যেন জমে পাথর হয়ে আছে।

অর্চনাকে হঠাৎ এমন হেসে উঠতে দেখে অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিলেন ননিমাধব। লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিলেন। দাদা, বৌদি উৎফুল্ল মুখে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসেছেন। অর্চনা হেসেই বলেছেন, কেন তোমরা রোজ এই তাজমহলে আস বলো তো? ভদ্রলোকের মন খারাপ হয়ে যায়।

এতদিনে দাদা সত্যিই বন্ধুর তারিফ করলেন মনে মনে। খুশির কানাকানি চলতে লাগল বরুণা আর বৌদির মধ্যে। সকলেরই একটা মনের বোঝা হালকা হয়ে আসছে।

পরদিনের প্রোগ্রাম ফতেপুর সিক্রি। মাইল পঁচিশ দূর আগ্রা থেকে। মোটরে চলেছেন সকলে। দূর থেকে ইতিহাসের স্মৃতি সমারোহের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হল সকলেরই। অর্চনার দিকে আড় চোখে চেয়ে ননিমাধব নিঃশব্দ কৌতূহলেরই আভাস পেলেন শুধু।

মোটর থেকে নামতেই তিন চারজন গাইড ছেঁকে ধরল তাঁদের। এ ব্যাপারটা দিল্লীতেও দেখেছেন, আগ্রাতেও দেখেছেন তাঁরা। অদূরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল একজন অতিবৃদ্ধ গাইড। শ্বেত কেশ, শ্বেত শ্মশ্রু। যোয়ানদের সঙ্গে ঠিকমত পাল্লা দিতে পারে না বলেই বোধ হয় সবিনয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। যদি কেউ নিজে থেকেই ডেকে নেয় তাকে।

ডেকে নিলেন। কেন জানি তাকেই পছন্দ হল ননিমাধবের। বুড়ো মানুষ, দেখাবে শোনাবে ভালো। গাইড ঘুরতে লাগল তাঁদের নিয়ে। গল্প করতে লাগল। ইতিহাসের গল্প। এটা কেন, ওটা কি, ইত্যাদি। চোস্ত উর্দুর অনেক কথাই বুঝলেন না কেউ। চেষ্টাও করলেন না বুঝতে। গাইড তার মনে কাজ করে যাচ্ছে, অর্থাৎ বকে যাচ্ছে। এঁরা নিজের মনে গল্পগুজব করতে করতে দেখছেন। শ্রান্তও হয়ে পড়েছেন একটু। এই বিশাল স্মৃতি-প্রাচুর্যের যেন শেষ নেই! এক সময় ননিমাধবই মন্তব্য করলেন, কি উদ্ভট সখ ছিল আকবর লোকটার, এরকম একটা ছন্নছাড়া জায়গায় এসে এই কাণ্ড করেছে বসে বসে!

গাইড তাঁর কথাগুলো সঠিক না বুঝুক, বক্তব্য বুঝল। গল্পের ভণিতা সুরু করল আবার। সখ নয় বাবুজি, শাহেন শা বাদশা এখানে ফকির চিশ্‌তির দোয়া মেঙে সব পেয়েছিলেন বলেই এখানে এই সব হয়েছিল।

গাইডের বকর বকর শুনে বরুণার কান ঝালাপালা হয়েছে। হালকা মন্তব্য করে সে আগে আগে চলল। দাদা বৌদিও গাইডের কথায় কান না দিয়ে নিজেরা কথা বলতে বলতে চলেছেন। গাইডের পাশে অর্চনা, কাজেই তাঁর পাশে ননিমাধব। গাইড বলতে লাগল, এই তামাম জায়গা তো জঙ্গল ছিল, কেউ আসত না, হাতী-গণ্ডার চরত। শাহেন শা আকবর যুদ্ধ-ফেরত এখানে এক রাতের জন্য আটকে পড়েছিলেন। এই ভীষণ জঙ্গলের গুহায় সাধন-ভজন করতেন এক পয়গম্বর পুরুষ—ফকির সেলিম চিশ্‌তি। এত বড় বাদশা তাঁকে দেখামাত্র কেমন যেন হয়ে গেলেন। তাঁর দোয়া মাঙলেন। শাহেন শার মনে ছিল বেজায় দুঃখু। খাস বেগম

মরিয়মের হু'হুটো ছেলে হয়ে মরে গেছে—আর ছেলে হয়নি। তখ্‌ত-এ-তাউসে বসবে কে ? কাকে দিয়ে যাবেন মশনদ ?

ফকির চিশ্‌তি বললেন, আল্লার ইচ্ছেয় বাদশাহের ছেলে হবে আবার। বেগমকে এইখানে নিয়ে আসতে বললেন সেলিম চিশ্‌তি। আকবর তাই করলেন। ন' মাস ছিলেন এখানে খাস বেগমকে নিয়ে। তার পর ছেলে হল। ছেলের মত ছেলে। বাদশা জাহাঙ্গীর। আকবর গুরুর নামে ছেলের নাম রেখেছিলেন সেলিম। ফকির-গুরুর আশ্রয়ে বসবাস করার জন্যেই সব জঙ্গল সাফ করে এখানে এত বড় রাজ দরবার গড়ে তুললেন বাদশা আকবর। ফকির বই বাদশা আর কিছু জানতেন না।

কখন যে নিবিড় আগ্রহে শুনতে শুরু করেছেন অর্চনা নিজেরই খেয়াল নেই। হঠাৎ কেন এমন করে স্পর্শ করল এই কাহিনী তাও জানেন না। শুনতে শুনতে একটি সমাধির কাছে এসে দাঁড়ালেন তাঁরা। মার্বেল পাথরের শুভ্র সমাধি লাল কাপড়ে জড়ানো, চারদিকে নক্সাকাটা পাথরের জালি দেয়াল।

গাইড জানালো, এই ফকির চিশ্‌তির সমাধি।

অর্চনা দেখছেন চুপচাপ। আর কি যেন একটা অজ্ঞাত আলোড়ন হচ্ছে ভিতরে ভিতরে। দাদা বৌদি বরুণা সামনেই ঘোরাঘুরি করছেন। হঠাৎ অর্চনার চোখে পড়ল, সেই জালির দেওয়ালে অসংখ্য সূতো আর কাপড়ের সরু টুকরো বাঁধা। সূতোয় আর কাপড়ের টুকরোয় সমস্ত জালির দেয়ালটাই বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে। অর্চনা গাইডকে জিজ্ঞাসা করলেন, এগুলো কী ?

গাইড জানালো, যাদের ছেলে হয় না তারা ছেলের জন্য ফকিরের দোয়া মেঙে এই সূতো আর কাপড় বেঁধে রেখে যায়।

কত দূর দূর দেশ থেকে নিঃসন্তান মেয়েরা সূতো বাঁধার জন্য এখানে আসে। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান সবাই আসে।, ছেলে কামনা করে এখানে এসে ভক্তিভরে সূতো বেঁধে দিলে ছেলে হবেই। ফকিরের আশীর্বাদ কখনো মিথ্যে হয় না। দু'শ বছর হতে চলল, কিন্তু লোকের এ বিশ্বাসে ফাটল ধরেনি আজও। বহু বিচিত্র দৃষ্টান্ত শোনাতে লাগল গাইড।

অর্চনার কানে তার এক বর্ণও ঢুকল না। কি একটা সুপ্ত ব্যথা খচ্‌খচিয়ে উঠছে ভিতরে ভিতরে। টকটকে লাল হয়ে উঠেছে সমস্ত মুখ। ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। ফকিরের সব কথা ননিমাধব শোনেননি। কিন্তু অর্চনার দিকে চেয়ে থমকে গেলেন তিনি।

—কি হল ?

জবাব না দিয়ে সূতো বাঁধা সেই জালির দেয়ালের চার দিকে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন অর্চনা। লক্ষ লক্ষ সূতো বাঁধা। প্রত্যেকটি সূতো যেন এক একটা রক্ত-মাংসের শিশু হয়ে দেখা দিতে লাগল চোখের সামনে।

কি এক অজ্ঞাত উত্তেজনায় অর্চনা কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলেন এক একবার। আবার কাছে এগিয়ে এলেন ননিমাধব। জিজ্ঞাসা করলেন, কি হল, খারাপ লাগছে কিছু ?

হঠাৎ যেন সচেতন হলেন অর্চনা। তাকালেন তাঁর দিকে। বললেন, না—গরম লাগছে, একটু জল পান কি না দেখুন তো···।

হন্তদন্ত হয়ে জলের বোতলের সন্ধানে গেলেন ননিমাধব। ঘাবড়ে গেছেন তিনি। জলের তৃষ্ণা দু'চোখে এমন করে ফুটে উঠতে জীবনে আর দেখেন নি কখনো।

ননিমাধব পা বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে অর্চনা একটা কাণ্ড করে

বসলেন। ফ্যাঁশ করে দামী শাড়ির আঁচলটা ছিঁড়ে ফেললেন। বৃদ্ধ গাইডের বিমূঢ় চোখের সামনেই সেই শাড়ির টুকরো জালির দেয়ালে বেঁধে দিয়ে দ্রুত সেখান থেকে সরে এলেন। দেহের সমস্ত রক্ত যেন মুখে উঠে এসেছে তাঁর। গাইড কয়েক নিমেষ তাঁর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে কি বুঝল সে-ই জানে। টেনে টেনে বলল, ফকিরের দোয়া কখনো মিথ্যে হয় না মাইজি, শুচি মত থেকো, আর বিশ্বাস করো।

জল নিয়ে এসে ননিমাধব হতভম্ব। কারণ, অর্চনা অন্যমনস্কের মত বললেন, জলের দরকার নেই। কিন্তু তাঁর মুখের দিকে চেয়েই কিছু একটা ঘটেছে বোঝা গেল। দাদা বৌদি বরুণাও অবাক। সকলেই জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন কি হয়েছে।

অর্চনা কথা বলতে পারছেন না, নিজেকে আড়াল করতে পারছেন না বলেই বিব্রত হয়ে পড়ছেন আরো বেশি। ছেঁড়া শাড়ির আঁচল ঢেকে ফেলেছেন, তবু অস্বস্তি যায় না। অস্ফুট স্বরে জানালেন, শরীর ভালো লাগছে না, এক্ষুনি ফেরা দরকার।

তাড়াহুড়ো করে হোটেলে ফিরলেন সকলে। কিন্তু কি ব্যাপার ঘটে গেল হঠাৎ ভেবে না পেয়ে সবাই যেন বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন। ননিমাধবকে এটা সেটা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন সকলে। কিন্তু তিনিও বিমূঢ়।

অর্চনা ঘোষণা করলেন, সেই রাতের ট্রেনেই কলকাতায় ফিরবেন। আবার আকাশ থেকে পড়লেন সকলে। কিন্তু তাঁর দিকে চেয়ে মুখে আর কথা সরে না কারো। স্থানীয় ডাক্তার ডেকে ব্লাড-প্রেসার দেখিয়ে নেওয়ার কথাও মনে হয়েছে সকলেরই। কিন্তু শোনা মাত্র অর্চনা রেগে উঠলেন এমন, যে কেউ আর একটি

কথাও বলতে পারলেন না।

সারা পথ এক অধীর প্রতীক্ষায় নিঃশব্দে ছটফট করতে দেখা গেল তাঁকে। বেশি রাতে সকলে যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন, ননিমাধব কাছে এলেন। সত্যিকারের আকৃতি নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে বলবে না?

অর্চনা সচকিত হয়ে তাকালেন তাঁর দিকে। কিছু একটা ভাবনায় যেন ছেদ পড়ল। দু চোখ ছলছল করে এলো কেমন। অস্ফুট জবাব দিলেন, কি বলব···।

এ ভাবে চলে এলে কেন?

অর্চনা তেমনি অস্ফুটস্বরে বলল, আর কত দেরি করব—অনেক দেরি হয়ে গেছে যে।

ননিমাধব ভড়কে গিয়ে চুপ করে গেলেন একেবারে।

হঠাৎ এভাবে ফিরতে দেখে মা পাঁচ কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। দাদা বিরক্ত হয়ে জবাব দিলেন, জিজ্ঞেস করে দেখো তোমার মেয়েকে, আমরা কিছু জানি না।

দুপুরের দিকে দাদা বেরিয়েছেন। বরুণা শ্বশুরবাড়িতে দেখা করে আসতে গেছে। বৌদি রাতের ক্লান্তি দূর করছেন।

অর্চনা চুপচাপ বেরিয়ে পড়লেন।

ট্রাম থেকে নেমে একটুখানি হাঁটা পথ। তারপর বাড়ি। দরজা বন্ধ। বন্ধই থাকে···। কড়া নাড়তে লাগলেন। সাড়া নেই। আরো জোরে কড়া নাড়লেন। মনে মনে হিসেব করছেন, যতদূর মনে পড়ে, এ দিনটা অফ-ডে। না কি রুটিন বদলেছে কলেজের! কিন্তু তাহলে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ কেন, বাইরে তালা ঝোলার কথা।

ওদিক থেকে দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল। শরীরের সমস্ত রক্ত আবার মুখে এসে জমছে অর্চনার।

দরজা খুলল। অর্চনা স্তব্ধ।

ছুপুরের ঘুম-ভাঙা চোখে দরজা খুলল একটি মেয়ে। বিবাহিতা। স্রস্ত বেশবাস। কোলে একটি ফুটফুটে শিশু।

দরজা খুলে মেয়েটিও অবাক।

অর্চনা সামলে নিলেন, জিজ্ঞাসা করলেন, এ বাড়িতে কে থাকেন ?

জিজ্ঞাসা করারও দরকার ছিল না। শিশুটির মুখের আদলে তার জবাব লেখা আছে।

ঈষৎ বিস্মিত মুখেই মেয়েটি জানালো কে থাকেন।

—ও, অর্চনা হাসলেন একটু, আমি ঠিকানা ভুল করেছি তাহলে। হাত বাড়িয়ে শিশুর গাল টিপে দিলেন।—বেশ ছেলে তো··· আপনার ? আপনাকে বিরক্ত করলাম বোধ হয় ? আচ্ছা নমস্কার।

কিছু জিজ্ঞাসাবাদের ফুরসত না দিয়ে ছেলের গালে আর একবার আঙুল স্পর্শ করে অতি আধুনিকার মতই টক টক করে বেরিয়ে এলেন অর্চনা বসু।

*　　　*　　　*

পাখি-ডাকা আবছা অন্ধকারে ভোরের আভাস। খর-খরে ছু'চোখের ওপর দিয়ে আর একটা রাতের অবসান হল। অর্চনা বসু উঠবেন। হাত-মুখ ধোবেন। তারপর চেয়ারে বসে ঝিমুবেন খানিক। বুড়ী ঝি চা নিয়ে আসবে। পর পর ছু'তিন পেয়ালা চা খেয়ে গা-ঝাড়া দিয়ে দাঁড়াবেন তিনি। চান করে আসবেন। ইস্কুলের খাতা দেখে বা বই পড়ে কাটাবেন কিছুক্ষণ। তারপর শুচিশুভ্র বেশবাসে নিজেকে ঢেকে ইস্কুলে যাবার জন্য প্রস্তুত হবেন। গাইডের শুচি মত থাকার নির্দেশ ভোলেন নি।

আর, তার কথামত বিশ্বাসটাও দূর করে উঠতে পারেন নি।

একটি অভিশাপ

মিথিলার সমীপস্থ বনে এক আশ্রম। ঘন সবুজের নির্জন সমারোহ-তটে আর একটুখানি ছন্দোবদ্ধ সবুজের মত। সমস্ত তমসার অবসান লেখা সেই তপোবনের রূপে। পুষ্প-ফল-সমন্বিত পুণ্য আশ্রম।

আশ্রমে বাস করেন ত্রিকালদর্শী মুনি মহাযশা গৌতম। মানুষের আচার-কলা-নিষ্ঠার নিয়ামক। মানুষের নীতি, মানুষের রীতির সংহিতাকার। স্থির চিত্ত, স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়, জ্যোতির্ময় পুরুষ।

আর থাকেন এক নারী। ত্রিভুবনের আকাঙ্ক্ষা দিয়ে গড়া সেই নারী। বিধাতার যত্নে সৃজিত, নিদ্রা-জাগরণ-স্মরণপথের মায়াময়ী মনোহারিণী। অগ্নিশিখার মত বর্ণমদির, ভাস্বরদেহিনী, অনন্তযৌবনা।

কিন্তু সেই অপরূপার মর্মস্তলে বর্ষণোন্মুখ মেঘের মত একখানি সংগোপন বেদনা পুঞ্জীভূত। পূর্ণচন্দ্র প্রভার মত তাঁর দীপ্ত রূপও যেন সেই বেদনাভারে তুষারাবৃত। অতিদীর্ঘ কৃষ্ণ-তারা সজল-চঞ্চল দু'চোখ মেলে সেই রমণী ঋষিকে দেখেন। তাঁর প্রিয় ঋষিকে দেখেন চেয়ে চেয়ে। মহাতেজা তপোমগ্ন ঋষি। কখনো শিষ্য পরিবৃত জ্যোতির্জ্ঞানদানে রত। কখনো বা মানুষের রীতি-নীতি আচার-কলা-নিষ্ঠার সংহিতা রচনায় মগ্ন। কিন্তু এ পৃথিবীর সামগ্রীর প্রতি দৃষ্টি নেই, অন্তরীক্ষে কি দেখার আনন্দে যেন স্থিরচিত্ত তিনি।

রমণী ভাবেন, এ কি অমোঘ নিয়মে বন্দী তাঁর প্রিয় ঋষি! রমণীর মন কি নিয়মের বাইরে? নিয়মের বাইরে রমণী মনের রীতি-নীতি? একটা দিনের জন্যেও মর্ত্যের তৃষ্ণা, মর্ত্যের আকৃতি

দেখলেন না তাঁর প্রিয় ঋষির অচপল সন্ধানী ওই চোখের তারায়। দিন আসে, সূর্য ওঠে। রাত্রি হয়, চাঁদ হাসে। আষাঢ়ের তপোবনে নেমে আসে নীল মেঘের ছায়া। শীত অবসানে প্রকৃতির তনুতে দেখা দেয় সবুজের আভাষ। বসন্তের সৃষ্টি-সজ্জার সমারোহে সেজে ওঠে মহাবীর্যবতী বসুন্ধরা। মর্ত্যের এই কাল-চক্রাবর্তে বাঁধা পড়েননি শুধু এক মর্ত্যের মানুষ—যিনি রচনা করেন মর্ত্যের রীতি-নীতি নিয়ম-নিষ্ঠায় সংহিতা। মানুষ নন্, ঋষি। প্রিয় ঋষি।

এক নিস্পৃহ সম্পূর্ণতার সমাধিবেষ্টনে অচঞ্চল, অচপল। মর্ত্যের এতটুকু ফাঁক নেই কোথাও। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন রমণী, পরিপূর্ণতার ডালি নিয়ে ফিরে যান। কুটির অভ্যন্তরে চলে যান বাতান্দোলিত লতার মত সৌন্দর্যের তনুভার নিয়ে।

এমনি করেই দিন গেছে, বছর গেছে, সহস্র বৎসর উত্তীর্ণ প্রায়।

না তারও অনেক, অনেক আগে থেকে দেখে এসেছেন এই জ্যোতিঃসিদ্ধ অচঞ্চল মূর্তি। রমণী তখন শুধু কুটিরবাসিনী। কুটির সীমন্তিনী নন। আর ওই মহাতপা জিতেন্দ্রিয় ঋষি তখনো হননি প্রিয় ঋষি।...কিন্তু অন্তর্যামী জানেন, হয়েছিলেন কি না।

সেদিনের কথা বিমনা হয়ে ভাবেন রমণী। কেন শুধু প্রজা সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হলেন না পিতা ব্রহ্মা? কেন অস্তিত্বের নিঃসীম সৌন্দর্য আহরণ করে এই দেহতটে এনে বন্দী করলেন তাঁকেও? সেই অনির্বাণ রূপে কোনো 'হল' নেই, কোনো বিরূপতা নেই বলেই খেয়ালী স্রষ্টা অহল্যা নামে ডেকেছিলেন তাঁকে। প্রাণ-চেতনায় দু'চোখ মেলে দেবতাদেরও চাঞ্চল্য উপলব্ধি করেছিলেন অহল্যা। মুগ্ধ কামনায় অধীর প্রশ্ন জেগে উঠেছিল তাঁদের দেব-নেত্রে। কার জন্য এই মনোমোহিনী সৃষ্টি? কোন্ দেবতার ভোগ্যা হবেন?

কিন্তু পিতা ব্রহ্মার বিচিত্র রীতি।

এই আশ্রমে, এই কুটিরে, এই ঋষির কাছে গচ্ছিত রেখে গেলেন তাঁকে। বলে গেলেন, শুধু সযত্নে লালন কোরো আমার মানসী কন্যাকে।

সযত্নে শুধু লালনই করেছিলেন ঋষি। তার বেশি কিছু মাত্র নয়। গচ্ছিত ধনকে আগলে রেখেছিলেন শুধু, কিছুমাত্র নয় তার বেশি। ভুবনমোহিনী নারীর অতি-দীর্ঘ কৃষ্ণ-তারা কত সময়ে আবদ্ধ হয়েছে ওই জ্যোতির্ধ্যানী মুখের ওপর। কিন্তু না। কোনো ব্যতিক্রম দেখেন নি অহল্যা। ওই বক্ষ অশান্ত হতে দেখেন নি এক মুহূর্তের জন্য। তপশ্চর্যায় বিঘ্ন ঘটেনি এক দণ্ডের জন্য। মানুষের রীতিনীতি আচার-সংহিতা রচনায় ছেদ পড়েনি একটি দিনের জন্যও।

দিন গেছে, বছর গেছে, শত শত বৎসর উত্তীর্ণ হয়েছে।

তারপর সহসা একদিন ডাক পড়েছে তাঁর। ঋষি ডেকেছেন। সে আহ্বান যেন একটা স্পর্শ হয়ে বিহ্বল করে ফেলেছে তাঁকে। ধড়মড়িয়ে উঠেছেন অহল্যা।

ঋষি ডেকেছেন, এসো।

কিন্তু এ ডাক যেন হিমগিরি নিঃসৃত একটা শব্দধ্বনি মাত্র।

তবু অহল্যার বিস্মিত নেত্রে একটুখানি জিজ্ঞাসার আশা।

ঋষি বললেন, তুমি গচ্ছিত ছিলে, এতদিনে সময় হয়েছে যাঁর কাছ থেকে এসেছিলে তাঁর কাছে ফিরে যাওয়ার।

নিষ্প্রাণ বহুমূল্য একখানি গচ্ছিত রত্নকেই যেন নিরাসক্ত চিত্তে ঋষি প্রত্যর্পণ করলেন ব্রহ্মার কাছে। দেবতারা সাধু সাধু করে উঠলেন ঋষির জিতেন্দ্রিয় সিদ্ধির মাহাত্ম্য দেখে। কিন্তু অহল্যা-দর্শনে দেবতাদের বাসনা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল আবার। এবারে কোন্

দেবতাকে অর্পণ করবেন ব্রহ্মা এই মূর্তিমতী মাধুর্যময়ীকে ?

দেবগণের রুদ্ধ-শ্বাস, কম্প্রবক্ষ, স্থির নেত্র।

কেবল সুরপতি ইন্দ্র ছাড়া। তিনি জানেন সুরশ্রেষ্ঠ তিনি। যোগ্যতায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ব্রহ্মা নিঃসন্দেহে স্বপ্নদৃষ্ট ত্রিভুবনমোহিনী অহল্যাকে অর্পণ করবেন তাঁরই কাছে। অনঙ্গ নিপীড়িত মৃদু হাস্যে রমণীর রূপ লেহন করেন সুরপতি ইন্দ্র।

কিন্তু মর্ত্যের এই ঋষির প্রতিই দৃষ্টিপাত করলেন ব্রহ্মা। পুরস্কৃত করলেন তাঁকেই। বললেন, এবারে এই রমণীকে তুমি গ্রহণ করো।

শুনে দেবগণ হতাশাস্পৃষ্ট, সুরপতির আনন ভ্রূকুটিকুটিল।

আবার সেই বন-বীথিকার আশ্রম, আর সেই ঋষি। কিন্তু এক নয় ঠিক। অহল্যার প্রিয় কুটির, আর প্রিয় ঋষি। আশা-আকাঙ্ক্ষা ভরা গভীর ছুটি চোখ মেলে অহল্যা আবারও চেয়ে চেয়ে দেখেছেন তাঁর প্রিয় ঋষিকে। ঋষি আনন্দিত। কিন্তু অহল্যা নির্বাক, সে আনন্দ সিদ্ধিলাভের—প্রাপ্তির নয়। এতকাল না পাওয়ার বেদনা যাঁকে স্পর্শ করেনি, এই পাওয়ার মাঝেও তিনি ঠিক তেমনি নির্বিকার। এই প্রাপ্তিতে মর্ত্যের কামনা, মর্ত্যের তৃষ্ণার চিহ্ন মাত্র নেই।

তেমনি এক মনে, এক ধ্যানে মানুষের রীতি-নীতি, নিয়ম-নিষ্ঠার সংহিতা রচনা করে চলেন ঋষি। অহল্যা এই নিয়মের অঙ্গীভূত হয়েছেন শুধু। যোগীর রসভাবে সহবাস থেকে বঞ্চিত হননি তিনিও। কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ যিনি, কোনো রসের তৃষ্ণা নেই যাঁর, তাঁর কাছে এই পরিপূর্ণতার ডালি তো শুধু শুষ্ক নিবেদন মাত্র।

দিন যায়, বছর যায়, সহস্র বৎসরের অবসান হয়ে আসে আবার।

ঋষির দিকে চেয়ে চেয়ে মর্ত্যের অসম্পূর্ণতা অনুসন্ধান করেন অহল্যা। মর্ত্যের তৃষ্ণার প্রতীক্ষা করেন।

ওদিকে কামনায় অধীর হয়ে উঠেছেন সুরপতি ইন্দ্র। ক্রুদ্ধ অসহিষ্ণুতায় মর্ত্যে নেমে আসতে হয়েছে তাঁকে। দেবতারা জানেন, তাঁদের রাজ্য নিরঙ্কুশ করার জন্যেই মর্ত্যে অবতীর্ণ হয়েছেন ইন্দ্র। ঋষি গৌতমের মহা-সাধনায় বিঘ্ন না ঘটালে সুরপতির আধিপত্য নিঃশেষ হবে, রূপান্তর ঘটবে স্বর্গের রীতির। তাই গৌতমের শিষ্য হয়েছেন সুরপতি ইন্দ্র। ছলনা-গূঢ় কৌশলে প্রিয় শিষ্য হয়ে উঠেছেন। ঋষির অভিশাপগ্রস্ত হলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে স্বর্গের—ঋষির পক্ষে সে তো স্খলনেরই নামান্তর। দেবতারা নিজের গরজে ইন্দ্রকে রক্ষা করবেন অভিশাপ থেকে, উপায় নির্ধারণ করবেন কিছু। ইন্দ্র নিশ্চিন্ত তাই।

কুটির-সীমন্তিনী অহল্যা একটা অজ্ঞাত আশঙ্কা উপলব্ধি করেন শুধু। কার অজ্ঞাত কামনার আঁচ লাগে, রোমাঞ্চ জাগায়। এই আঁচ, এই রোমাঞ্চ কাম্য। প্রিয় ঋষির দিকে চেয়ে থাকেন নির্নিমেষে। কিন্তু না। তেমনি ঊর্ধ্বলোকে, অন্তরীক্ষ পথে অনুপস্থিত তাঁর দৃষ্টি।

একদিন।

মহাকালের চক্রধারা থেকে যেন বিচ্ছিন্ন ওই একটি দিন। অহল্যা বিমনা হয়ে পড়ছেন বার বার। এক অজ্ঞাত শিহরণের অনুভূতি চোখের কোণে অশ্রু হয়ে জমে উঠছে থেকে থেকে। মনে হচ্ছে কিছু যেন ঘটবে আজ। কালান্তক কিছু। এ কি তাঁর প্রিয় ঋষির অমঙ্গলের সূচনা কোনো? অহল্যা আনমনা হয়ে পড়েন আবার।

ঋষি নদীতে গেছেন উপাসনা স্নানে। পুণ্যস্নানে অন্তরলোক-শুদ্ধির মার্জনায় মর্ত্যের আকর্ষণ শিথিল হবে আরো একটু।

কুটিরের মধ্যে সহসা সচকিত হয়ে ওঠেন অহল্যা। নির্জন বন-পথের শুষ্ক পত্র-মর্মরে কার পদধ্বনি কানে আসে? পদধ্বনি অচেনা নয়। কিন্তু যেন চেনাও নয় ঠিক। প্রায় সঙ্গীতের মত লাগছে সেই ত্বরিত পদধ্বনি। প্রিয়া-বিরহক্লিষ্ট তৃষাতপ্ত আকৃতি নিয়ে আসছেন যেন কেউ। প্রিয় ঋষি আসছেন। কিন্তু এই আসার মধ্যে মর্ত্যের সুর বাজছে কেমন করে? তাছাড়া, এরই মধ্যে তো তাঁর ফেরার কথা নয়!

কিন্তু তবু আসছেন তিনি সন্দেহ নেই।

তাড়াতাড়ি কুটির-আঙ্গিনায় এসে দাঁড়ালেন অহল্যা। ঋষি এলেন। হাতে কমণ্ডলু। সদ্যস্নাত। কিন্তু সে-স্নান অসমাপ্ত বোঝা যায়। সর্বাঙ্গে তাঁর ব্যাকুল প্রত্যাশা, দুই চোখে মর্ত্যের কামনা, মর্ত্যের তৃষ্ণা!

অর্ধ বিস্ময়ে, অর্ধ বিশ্বাসে অহল্যা স্তব্ধ ক্ষণকাল। মৃগী চোখের ক্ষণ-বিহ্বলতায় চেয়ে থাকেন ঋষির দিকে।

ঋষি হাসছেন মৃদু-মন্দ। সেই হাসিতে মর্ত্যের আমন্ত্রণ, মর্ত্যের নিবিড়তা। বহু যুগের প্রবাস অবসানের নির্নিমেষ বিহ্বলতায় দেখছেন যেন আপন প্রিয়াকে। চন্দ্রকর আর পুষ্প সৌরভকে শরীরী করে গড়ে তোলা নারীকে দেখছেন প্রথম-দর্শনের নির্বাক ব্যাকুলতায়।

সেই অবকাশে ঋষিকে নিবিড় করে পর্যবেক্ষণ করে নিলেন অহল্যা।···ঋষি, তাঁরই প্রিয় ঋষি বটে। তাঁরই বহু প্রত্যাশিত মর্ত্যের তৃষ্ণা নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে। কিন্তু এমন লাগছে কেন? ওই কুন্দ-ধবল ঋষি অঙ্গে কোথায় দেখা এক পিঙ্গল জ্যোতির আভা জাগছে কেন? নিরাভরণ কর্ণদ্বয়ে যেন চেনা দুটি মণিময়

কুণ্ডলের দ্যুতির আভাষ কেন ? ঋষি আননের দিকে চেয়ে চেয়ে চেনা একটা কণ্টক পাশের ছায়া চোখে ভাসছে কেন ? কমণ্ডলু-ধরা হাতে কেন দেখছেন বজ্রায়ুধের গোপন শক্তি ? ঋষিবেশে প্রচ্ছন্ন দেখছেন কেন এক যুদ্ধনিপুণ ঝটিকাপ্লাবন প্রাকৃতিক অধিষ্ঠাতার ছদ্ম সাজ ? আর ওই প্রণয়াভিলাষী দুই চোখের গভীরে কেন অমরাবতীর সোমাসক্ত আবেশ ?

কিন্তু সামনে দাঁড়িয়ে ঋষি। অহল্যার প্রিয় ঋষি। যাঁর চোখে মর্ত্যের চাতক-তৃষ্ণা। অহল্যার সহস্র বৎসরের প্রতীক্ষিত।

সহসা সচেতন হলেন অহল্যা। স্ফুরিত-বিম্বাধরে হাসির ঝলক দেখা দিল। নিবিড় কটাক্ষপাত করলেন ঋষির প্রতি। সেই বিদ্যুদ্দামস্ফুরণচকিত কটাক্ষ, অপাঙ্গ অর্ধদৃষ্টি, যোগী-মুনি-যুবা-বৃদ্ধ-বিভ্রমী ওষ্ঠ দর্শনের পুলকিত শিহরণে ঋষির মর্ত্য-কামনা উদ্বেলিত।

অহল্যা বললেন, এমন অসময়ে ফিরলে ?

ঋষি বললেন, স্নান সম্পন্ন হল না, তোমার সহস্র বৎসরের ব্যর্থ প্রতীক্ষা হঠাৎ যেন শুনতে পেলাম ভরা নদীর হাহাকারে। পয়ঃস্বিনীর ঢেউ বার বার আমাকে ঠেলে দিতে লাগল এই কুটিরের দিকে। আজ ধন্য আমি, নূতন দৃষ্টিতে দেখতে পেলাম তোমাকে, আমাকে বিমুখ কোরো না।

অহল্যা হাত ধরলেন তাঁর। ডাকলেন, এসো।

তারপর প্রকৃতির রুদ্ধ বাতাসে তপোবনের পল্লব-মর্মর নিথর হয় কিছুক্ষণের জন্য। শিরিষ শাখায় ফাগুন স্তব্ধ হয়ে থাকে। শাল-তাল-তমালের মূক ছায়া দীর্ঘতর হয়ে অসময়ে কুটির প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে।

ঋষি বহির্গমনের জন্য প্রস্তুত হলেন। অসমাপ্ত স্নান সমাপন

করতে যাবেন এবার। কিন্তু অন্তস্তলের এক গোপন উল্লাস ঋষি-অঙ্গে সেই চেনা পিঙ্গলের আভা ছড়াচ্ছে। অহল্যার দীর্ঘায়ত নেত্র-পল্লব ঋষির মুখে স্থির সংবদ্ধ। শান্ত মুখে প্রশ্ন করলেন, তৃপ্ত হয়েছ বাসব ?

বাসব! শোনামাত্র দারুণ বিস্ময়ে চমকে উঠলেন বাক্যাহত ঋষি। আবার নতুন করে দেখলেন যেন চম্পকদাম-বর্ণ ফুল্লেন্দী-বরতলচক্ষু নারীকে। বিহ্বল প্রশ্ন করলেন ফিরে, আমাকে চিনেছিলে তুমি ?

চিনেছিলাম বাসব।

ঋষিবেশী বাসবের সোমাসক্ত নেত্রদ্বয় নারীতনুহরণের আনন্দ-স্মৃতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। ঈষৎ বক্রকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, চিনেও আমাকে গ্রহণ করেছ ?

অহল্যা বললেন, তুমি চতুর বাসব। আমার প্রিয় ঋষির মূর্তিতে সহস্র বৎসরের প্রতীক্ষার রূপ নিয়ে এসেছ তুমি। আমিও তৃপ্ত। কিন্তু তুমি চলে যাও বাসব, ঋষির প্রত্যাবর্তনের সময় হল, তাঁর কোপ থেকে নিজেকে রক্ষা করো।

দ্রুত প্রস্থানোদ্যত হলেন ঋষিরূপী বাসব।

কিন্তু বিলম্ব হয়ে গেছে। আশ্রমের আঙ্গিনায় এসে পড়েছেন অমিত বীর্যবলের আশ্রয়নিবন্ধন দেবগণেরও দুর্ধর্ষ দীপ্ততেজা ঋষি গৌতম। পুণ্যতীর্থ সলিলে সিক্ত দেহ আজ্যসিক্ত অনলের মত রুদ্র-নেত্র গৌতম। হাতে কুশ ও সমিধ। আশ্রমের দিকে দ্রুত ধেয়ে আসছেন। যথার্থই আজ পুণ্য-স্নান সমাপন হয়নি তাঁরও। যথার্থই আজ পুণ্য পয়ঃস্বিনীর ঢেউ অসময়ে তাঁকে ঠেলে দিয়েছে কুটিরের দিকে।

গৌতমের অভিশাপ নিয়ে নতশির বিষণ্ণবদনে প্রস্থান করলেন সুরপতি ইন্দ্র।

তারপর রুদ্ধ রোষে ঋষি তাকালেন ভার্যা অহল্যার দিকে। শত সহস্র বৎসরের ধ্যানী স্থৈর্য ধূলিসাৎ হল এক মুহূর্তে। অভিশাপ দিলেন, তুমি অস্থিরচিত্ত অনন্তরূপযৌবনসম্পন্না—সকলের অদৃশ্য, শুধু বায়ুভুক পাষাণের স্থিরতায় বন্দী হ'য়ে থাকো।

মূক বেদনায় নিস্পন্দ আচ্ছন্ন বন-তপোবন।

স্থির অচঞ্চল পাষাণময়ী অহল্যা দু চোখ মেলে তাকালেন প্রিয় ঋষির দিকে। অনেকক্ষণ ···। অস্ফুট প্রশ্ন করলেন, এ অভিশাপের কি অবসান হবে কখনো ?

অভিশাপ-বাণী উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মর্ত্যের বিরহ যেন স্পর্শ করছে মানুষের নিয়ম-নিষ্ঠা রীতি-নীতি-সংহিতাকার ঋষি গৌতমের অন্তরে অন্তরে। অহল্যার কণ্ঠস্বর আজ এই প্রথম যেন একটা অনুভূতি হয়ে প্রবেশ করল তাঁর মর্ত্য-হৃদয়ের গভীরে। কণ্ঠস্বরে অশ্রুর ছোঁয়া লাগল নিজের অজ্ঞাতে। বললেন, আজ থেকে সহস্র বৎসর পরে শ্রীরামের পুণ্যপাদস্পর্শে তোমার মুক্তি।

সর্ববিরূপতামুক্ত অহল্যার শান্ত অচপল দৃষ্টি তেমনি নিবদ্ধ ঋষির মুখের ওপর। জিজ্ঞাসা করলেন, সে-মুক্তির পর আবার কি মিলন হবে ?

গৌতমের অন্তস্তল উদ্বেলিত হয়ে উঠল আবারো। ক্ষুদ্র জবাব দিলেন, হবে, আমি প্রতীক্ষা করব।

যুক্ত করে প্রণাম-আনত হয়ে অভিশাপ গ্রহণ করলেন অহল্যা। অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, তোমার সে প্রতীক্ষা যেন এই মর্ত্যের প্রতীক্ষা হয় প্রিয় ঋষি।

